দ্য
ফার্স্ট মেন
ইন
দ্য মুন

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন

● এইচ্, জি, ওয়েলস্ ●

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

THE FIRST MEN IN THE MOON
CODE NO. 4-29-309

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

মে
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮.০০

উপহার

লেখক-পরিচিতি

ইংরেজী সাহিত্যে এইচ্, জি, ওয়েলস্ এক চিরস্মরণীয় নাম। সাহিত্যের এমন শাখা নেই—গল্প, উপন্যাস, ব্যংগরচনা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, ধর্ম—যা তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়নি। বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন ইংরেজ লেখকই তাঁর মত এত বিভিন্ন বিষয়ে এত বেশী সার্থক রচনা করেননি।

ওয়েল্সের অবদানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু কুশলী ঔপন্যাসিকই নন, সার্থক বিজ্ঞানবিদ্ও বটেন। উপন্যাসের কল্পনা ও বিজ্ঞানের ভিত্তি—এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের তিনি এমন সব পরমাশ্চর্য কাহিনী রচনা করে গেছেন, যা আজও সমানভাবে সকল পাঠককে রস জুগিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর এই কল্পনা বহু বৈজ্ঞানিককেও নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

গ্রহান্তরে যাওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল অনেক চেষ্টাই করেছেন, তাঁদের কোন কোন প্রচেষ্টা কতকাংশে সফলও হয়েছে। এই পারমাণবিক যুগে সে চেষ্টা হয়ত আরও সফল হবে। ওয়েল্সের বৈশিষ্ট্য এই যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগেই তিনি তা সম্ভব বলে মনে করতে পেরেছিলেন। দ্য ফার্স্ট মেন ইন্ দ্য মুন, দি আয়ল্যান্ড অব্ ডক্টর মরো, দ্য ওয়ার অব্ দ্য ওয়ার্লডস্ প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত পুস্তকগুলি আজও বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী রচনার আদর্শরূপে স্বীকৃত।

তিনি সবসুদ্ধ আশিখানিরও বেশী বই লিখে গেছেন। তাদের অনেকগুলির খ্যাতি আজও সমান অক্ষুণ্ণ আছে।

দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন

এক

দক্ষিণ ইটালীর নীলাকাশের নীচে আঙ্গুরলতার ছায়ায় বসে যখন এই কাহিনী লিখছি, তখন অবাক্ হয়ে ভাবছি, কেভরের অত্যাশ্চর্য অভিযানের সঙ্গী হওয়া নেহাতই দৈবের খেলা। কারণ সে সময় সব রকম অনিশ্চয়তাকে এড়িয়ে চলাই ছিল আমার লক্ষ্য। তাই আমি বেছে বেছে লিম্পনির মত অজ পাড়াগাঁয়ে আস্তানা নিয়েছিলাম। কারণ আমার বিবেচনায় এমন নিভৃত গ্রাম আর জুটি ছিল না। আশা করেছিলাম, এখানে নিরিবিলিতে কাজ করতে পারব। কোন কিছুই এখানকার নির্জন পরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

কিন্তু মানুষ এক রকম ভাবে, বিধাতা আর এক রকম করেন।

আমার বয়স তখন বেশী নয়। কাঁচা বয়সের যা ধর্ম, আমারও তাই ছিল। অভিজ্ঞতা ছিল না, অথচ অহমিকা ছিল। ভেবেছিলাম, ব্যবসায়ে আমার পাকা বুদ্ধি আছে। অই অহমিকা সম্বল নিয়েই ব্যবসায়ে নেমেছিলাম। ফলও তেমনি ফলল। ব্যবসায়ে ভরাডুবি হল। দেনার দায়ে চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যাবার যোগাড় হল।

এমন অবস্থা দাঁড়াল, সামান্য কেরানীগিরি বা এমনি একটা কিছু না করলে দেনা শোধের আর কোন উপায় নেই। ব্যবসা থেকে একেবারে কেরানীগিরি!—এতটা নামতে মন মানল না। আমার সামনে তখন আর একটিমাত্র পথ খোলা ছিল। নাটক লেখা। ছেলেবেলা থেকেই লেখায় একটু আধটু হাত ছিল। তাই ভাবলাম, নাটকই লিখব। যদি চলে, তবে শুধু দেনা শোধ নয়,

হাতেও কিছু জমবে। তখন আবার নূতন করে জীবন শুরু করা যাবে।

শহরে বসে যে লেখা চলবে না, তা দুদিনেই বুঝা গেল। পাওনাদার ঠেকাতেই দিন যায়, লেখার সময় আর হয় না। তা ছাড়া লিখতে গেলে চাই নির্জন পরিবেশ, নিরবচ্ছিন্ন অবসর। যাতে মাথাটি ঠাণ্ডা থাকে, শান্তিতে সবকিছু ভাবতে পারি।

তাই লিম্পনি গ্রামে ছোট একটি বাংলো ভাড়া করলাম। কিছু কিছু আসবাবপত্রও সংগ্রহ হল। নিজ হাতেই কফি তৈয়ার করি, নিজ হাতেই রান্না করি, খাই। একেবারে সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন। আমার যা সাধনা—সার্থক নাটক লেখা—তার জন্য এমন সরল জীবনই তো সব দিক দিয়ে অনুকূল।

বাস্তবিক, নির্জন পরিবেশ পেতে হলে লিম্পনির মত এমন চমৎকার জায়গা আর নেই। কেন্টের সমুদ্রকূল থেকে সামান্য দূরে এই গ্রাম। তার চারদিকেই জলা। এই জলার মাঝখানে একটা পাহাড়ের গায় আমার বাংলা। জানালা খুললেই সমুদ্র দেখা যায়।

যখন বর্ষা নামে, একটানা বৃষ্টি শুরু হয়, তখন পথঘাট কাদায় ভরে যায়। লোকজনের চলাচল একবারেই কমে যায়, জনবিরল গ্রামটি আরও নির্জন হয়ে ওঠে।

আমার লেখার টেবিলটি ছিল জানালার কাছে পাতা। সেখানে বসে যখন কাজ করতাম, তখন জলার চমৎকার দৃশ্যটি আমার চোখে পড়ত। এখানে ওখানে জলজ গাছ, গাছে গাছে নানা রঙের ফুল। এই দৃশ্যটি আমার মনকে নানাভাবে উদ্দীপ্ত করত।

সেদিন আমি টেবিলের কাছে বসেছি। এমন সময় বাইরের দিকে চোখ পড়তেই কেভরকে প্রথম দেখলাম।

তখন দিনের আলো নিভে এসেছে। আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল সবুজ আর সোনালী রঙের খেলা। তারই মাঝে চোখে পড়ল কিম্ভূতকিমাকার কেভরকে।

ভদ্রলোক বেঁটে, মোটা। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মত টুপি, গায়ে ওভারকোট। পরনে সাইকেল-আরোহীদের মত আঁটসাঁট ট্রাউজার আর মোজা। তিনি কোনদিন ক্রিকেট খেলেননি, সাইকেলও চড়েননি। তবুও যে কেন এই অদ্ভুত পোশাকের উপর তাঁর এমন ঝোঁক ছিল, তা তিনিই জানেন।

হাঁটবার সময় তাঁর হাত দুটি অদ্ভুতভাবে নড়ত, মাথাটি অদ্ভুত-ভাবে দুলত। মুখ দিয়ে বেরুত হুসহুস শব্দ। খুব জোরে জোরে পা চালিয়ে তিনি আমার বাংলোর দিকে আসতেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেন, পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখতেন, একটু ইতস্ততঃ করে আবার পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করতেন।

সেই তাঁকে প্রথম দেখা। আমার মন তখন নাটকের পরিকল্পনায় ব্যস্ত। মাথায় তখন নাটকের প্লট দানা বাঁধছে, কোন্ চরিত্র কি ভাবে ফুটিয়ে তুলব, সেই চিন্তায়ই ডুবে আছি। এমন সময় এই অদ্ভুত লোকটির এখানে এমন আবির্ভাবে মনে মনে বিরক্তি বোধ করলাম। যে পাঁচ মিনিট তাঁর দিকে চেয়ে ছিলাম, সেই পাঁচটা মিনিটই অনর্থক নষ্ট হল বলে মনে মনে অনুতাপ হল।

যাহোক, মন স্থির করে আমি আবার আমার নাটক নিয়ে বসলাম। কিন্তু দিনের পর দিন এই ভদ্রলোক যখন একই সময়ে একই ভাবে জোরে জোরে পা চালিয়ে আসতেন, হঠাৎ থেমে দাঁড়াতেন, ঘড়ি দেখতেন, আবার ফিরে যেতেন, তখন আমি তাঁকে মনে মনে অভিসম্পাত করতাম। তারপর বিরক্তির পরিবর্তে মনে জাগল কৌতূহল। তাঁর এ ধরনের বেড়ান, ঘড়ি দেখা—এর মানে কি?

দু'সপ্তাহ পর আমি আবার কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। তাঁকে আসতে দেখা মাত্র দোর খুলে বেরুলাম এবং তিনি যেখানে এসে দাঁড়ান, আমিও সেখানে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তখন তাঁর ঘড়িটি খুলে সময় দেখবার উদ্যোগ করছেন।

এখনই ফিরবেন। এমন সময় আমি তাঁর মুখোমুখি এসে বললাম, "এক মিনিট একটু দাঁড়াতে পারেন কি?"

"এক মিনিট? নিশ্চয়ই দাঁড়াব। কিন্তু তার বেশী সময় কথা বলতে হলে, আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"মোটেই না।" বলে আমি তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম।

"আমার সব কাজই আমি ঘড়ি ধরে করি। এমন কি লোকজনের সাথে কথাবার্তার সময়ও একবারে ধরাবাঁধা। কোন কাজেই সময়ের একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।"

"এটা বুঝি আপনার ব্যায়ামের সময়? আর জোরে জোরে হাঁটাই বুঝি আপনার ব্যায়াম?"

"ঠিকই ধরেছেন! তা ছাড়া সূর্যাস্ত দেখতেও আমার বেশ ভালো লাগে।"

"কিন্তু আপনি তো আকাশের দিকে তাকিয়েও দেখেন না।"

"কি বললেন?"

"ঠিকই বলেছি।"

"তাই নাকি?"

"আজ চোদ্দ দিন ধরে আপনাকে দেখছি। কিন্তু কোনদিন আপনি সূর্যাস্তের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন বলে তো দেখিনি।"

আমার কথা শুনে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। যেন মহা সমস্যায় পড়েছেন। তারপর বললেন, "যাই বলুন, এই অস্তগামী সূর্যের শোভা, চারদিকের এই মনোরম পরিবেশ আমার চমৎকার লাগে। এই পথ দিয়ে হাঁটা, ওই গেট পর্যন্ত যাওয়া—এতেও আমি আনন্দ পাই।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলেন।

আমি বললাম, “কোন কিছুই আপনার ভাল লাগে না। গেট পর্যন্ত আপনি কোন দিনই যান না। আজও যাননি।”

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, “ও! আজ বুঝি যাইনি! হাঁ, মনে পড়ছে বটে। কারণ কি জানেন? ঘড়িতে দেখলাম, আমার বেড়াবার যে আধ ঘণ্টা সময় বাঁধা আছে, এমনিতেই তার চাইতে তিন মিনিট দেরি হয়ে গেছে। কাজেই আর এগুবার উপায় ছিল না।”

“কিন্তু রোজই তো আপনি তাই করেন!”

তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন। খানিক কি ভাবলেন। তারপর বললেন, “হয়তো করি। আপনি বলায় এখন বুঝতে পারছি। যাক্, আপনি আমাকে কি বলতে চান, বলুন তো।”

“এই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম।”

“শুধু ওই কথা!”

“হ্যাঁ। আপনি যখন বেড়াতে আসেন, তখন এরূপ অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করেন কেন? এমন হুসহুস শব্দই বা আপনার মুখ দিয়ে বেরোয় কেন?”

“অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করি, হুসহুস শব্দ করি?”

“হ্যাঁ। ঠিক এই রকম।” এই বলে আমি তাঁর অঙ্গভঙ্গী ও হুসহুস শব্দের অনুকরণ করে দেখালাম।

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, “আমি এসব করি?”

“রোজই করেন।”

“তা হলে তো আমার ভারী একটা বদ অভ্যাস হয়েছে। আমার মাথায় এখন নানা চিন্তা। তার মধ্যে এই বদ অভ্যাস! আপনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছেন।”

“ঠিক বিরক্ত হয়নি। কিন্তু ভাবুন, যদি আপনাকে এ সময়ে একটা নাটক লিখতে হত।”

"সে আমার দ্বারা কিছুতেই হত না।"

"কিংবা ধরুন, এমন কোন কাজ, যাতে খুব একাগ্রতা দরকার।"

"হ্যাঁ, তাই তো !" এই বলে তিনি আবার ভাবতে শুরু করলেন। তাঁর মুখে অনুশোচনার চিহ্ন ফুটে উঠল। দেখে আমার দুঃখ হল।

আমি সহানুভূতির সুরে বললাম, "অবশ্য আপনার যা ইচ্ছে, তা করবার অধিকার আপনার আছে। এতে কারো কিছু বলবার নেই।"

"এ আপনি কি বলছেন ? এমন একটা জঘন্য অভ্যাস, এ আমাকে ছাড়তেই হবে। তা ছাড়া আজকাল আমি ভারী অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। এটাও শোধরান দরকার।···যাক, কথায় কথায় আপনাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছি। এটাও ঠিক হয়নি।"

"এজন্য আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। আমিই বরঞ্চ যেচে আপনার সাথে আলাপ করতে এসে আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম।"

"সে কি কথা ! আমিই বরঞ্চ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমার এত বড় একটা বদ অভ্যাসের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।"

এর পর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। একটু বাদে পিছন ফিরে দেখলাম, ভদ্রলোক আস্তে আস্তে হাঁটছেন, আগের সেই অঙ্গভঙ্গীও নেই। বুঝলাম, তখন থেকেই তিনি তাঁর বদ অভ্যাস ছাড়বার চেষ্টা করছেন।

পর দিন আর তাঁর দেখা নেই। তার পর দিনও তাই। তৃতীয় দিনে তিনি আমার বাড়ি এসে হাজির। একথা সেকথার পর তিনি বললেন, বছরের পর বছর তিনি আমার বাংলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন। কিন্তু আমার জন্য এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না।"

শুনে তো আমি অবাক। বললাম, "সে কি মশাই, আমি কি করলাম ?"

তিনি বললেন, "জানেন, আমি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আছি। এ সময় মানসিক প্রশান্তি খুব দরকার। বিকালের এই আধ ঘণ্টাই ছিল আমার সবচেয়ে ভাল সময়। বেড়াতে বেড়াতে আমি শান্ত মনে আবার গবেষণার কথা ভাবতাম, নূতন নূতন ভাব আমার মনে আসত, নূতন নূতন স্বপ্ন দেখতাম। আপনি এসেই সব মাটি করে দিলেন।"

"আমি?"

"তা নয়ত কি!"

"আপনি ফের বেড়ানো শুরু করুন।"

"তা আর হয় না। এদিকে এলেই আমার নিজের চিন্তা মাথায় উঠবে। কেবলই মনে হবে, আপনার নাটক লেখায় আমি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি, আমার হাত পা নাড়া, আমার হুসহুস শব্দে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। তাই দু'দিন বেড়ানই বন্ধ করেছি। সেও যে কি কষ্ট তা আমিই জানি।"

"তা হলে অন্য কোন রাস্তায় বেড়ান।"

"এখানে বেড়াবার আর কোন রাস্তা নেই।"

"তবে এক কাজ করুন। আপনি রোজ আমার এখানে আসুন, আপনার গবেষণার গল্প করুন। এতে আপনারও মনটা হালকা হবে, আমিও নাটক লেখার একঘেয়েমি থেকে বাঁচব। আজই কিছু বলুন না।"

মনে মনে সন্দেহ ছিল, তাঁর গবেষণার গোপন কথা হয়তো তিনি প্রকাশ করবেন না। কিন্তু দেখলাম, সে সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। আমার অনুরোধের যা অপেক্ষা! তিনি এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। সব বুঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, তাঁর অনেক কথাই আমার মাথায় ঢুকল না। অর্ধেক কথা তো শুধু বিজ্ঞানের পরিভাষা—যা এর আগে কোন দিন শুনিও নি।

কিন্তু আমি এমন ভান করতে লাগলাম যেন সব বুঝতে পারছি।

তাঁর কথার সাথে 'হুঁ' 'হুঁ' তো করে যেতে লাগলামই, মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্নও করলাম।

তাঁর সব কথা বুঝলাম না বটে, কিন্তু এটা পরিষ্কার বুঝা গেল, যে তাঁর এই গবেষণা ছেলেখেলা নয়। তাঁর মধ্যে একটা সত্যিকার বিজ্ঞানীর মন আছে। তাঁর মুখেই শুনলাম, তাঁর একটি নিজস্ব গবেষণাগার আছে। তিনজন সহকারী সেখানে তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করে। তিনি আমাকে তাঁর গবেষণাগার দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন।

বিদায় নেবার সময় কেভর বারবার এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যে, তিনি আমার অনেকখানি সময় নষ্ট করলেন। তারপরই আবার বললেন, "দেখুন নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে মন খুলে আলোচনা করার মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা দুর্লভ। আপনার মত সমঝদার শ্রোতা পাওয়া তো আরও ভাগ্যের কথা।"

আমি আমার সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত শুনে মনে মনে হাসলাম। মুখে বললাম, "আপনার একটা অভ্যাস আমার জন্যই ছাড়তে হচ্ছে। এবার আমাকে নিয়েই নূতন আরেকটা কাজ অভ্যাস করুন। আপনি আমার এখানে আসুন, আপনার গবেষণার কতখানি অগ্রসর হতে পারছেন, তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা করুন। এটা তো পরিষ্কারই বুঝতে পারছেন, আমার কাছে আপনার গোপন তথ্য ফাঁস করলেও আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমি নিজেও এ নিয়ে কিছু করতে পারব না, অন্য কোন বিজ্ঞানীর সঙ্গেও আমার আলাপ নেই।"

তিনি খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। আমার কথাটা তাঁর মনে ধরেছে মনে হল। তিনি বললেন, "আমার এই সব আলোচনা আপনার কাছে বিরক্তিকর মনে হবে না তো?"

"আমাকে কি আপনি এতই বোকা ভাবছেন যে, আপনার কথাও আমি বুঝতে পারব না?"

"না না, তা নয়। তবে বিষয়টা একটু দুর্বোধ্য কিনা।"

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আপনি আজ যা বললেন, তাতে আমার ঔৎসুক্য আরও বেড়েই গেছে।"

"শুনে খুশী হলাম! আপনার সাথে আলোচনায় আমারও লাভ হবে। কারণ আপনাকে বিষয়টি বুঝাতে গেলে, আমার নিজের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনার সময় হবে কি?"

"বলেন কি? বাঁধা কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে আমার মাথাটাও পরিষ্কার হবে।"

তাই ঠিক হল। তিনি বিদায় নিয়েও আবার ফিরে এলেন। বললেন, "আমার মুদ্রাদোষ থেকে আমি যে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি, সে শুধু আপনারই জন্য। এজন্য আমি যে আপনার কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ তা আর কি বলব?"

এই বলে তিনি আমার বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। দেখা গেল, তাঁর হাত আর মাথা ঠিক আগের মতই দুলছে। একটুও পরিবর্তন হয়নি।

যা হোক, তিনি পর পর দু'দিন এলেন। দু'দিনই পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে, ইথার কি, শক্তি কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়, এসব জটিল বিষয়ে তিনি খুব সহজ করে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। আমি যে না বুঝেও বোঝার ভান করছি, এটা তাঁর মনেই এল না।

দুই

তারপর প্রথম সুযোগেই আমি তাঁর বাড়ি গেলাম। বাড়িটা বেশ বড়, তবে আগোছালো। তার তিনজন সহকারী ছাড়া অন্য কোন চাকর-বাকর নেই। কিন্তু তাঁর গবেষণার ব্যবস্থা চমৎকার। গোটা একতলাটা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে ঠাসা, রান্নাঘরে বসানো

হয়েছে বিরাট চুল্লী, মাটির নীচের ভাঁড়ার ঘরে বসেছে ইলেকট্রিক ডাইনামো। কেভর আমাকে মহা উৎসাহে সব কিছু দেখাতে লাগলেন।

কেভরের গবেষণার বিষয় হল এমন একটা বস্তু বার করা, যা সব রকম র‍্যাডিয়েণ্ট শক্তির প্রভাবমুক্ত হবে। র‍্যাডিয়েণ্ট শক্তি কাকে বলে, আমাকে তা বুঝাবার জন্য কেভর দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর অনেক কথাই আমি বুঝতে পারিনি। সব কথা আমার মনেও নেই। সে জটিল তত্ত্বকথা আমি বুঝিয়ে বলতেও পারব না। তাই সংক্ষেপে বলছি।

কেভরের মতে আলোক, উত্তাপ, এক্স-রে, মাধ্যাকর্ষণ—এ সবই হচ্ছে র‍্যাডিয়েণ্ট শক্তির মূল। এরা তাদের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে শক্তি বিচ্ছুরিত করে এবং দূরের বস্তুর উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর প্রায় সব বস্তুই কোন না কোন র‍্যাডিয়েণ্ট শক্তির প্রভাবমুক্ত। যেমন, কাচ আলোর বেলায় স্বচ্ছ, কিন্তু উত্তাপের বেলায় তেমন নয়। আবার কটকিরির মধ্য দিয়ে আলো অবাধে চলাচল করতে পারে, কিন্তু তাপকে তা সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করে।

কিন্তু পৃথিবীর কোন জিনিসই মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিমুক্ত নয়। আলো বা উত্তাপকে কোন না কোন জিনিস দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু কোন কিছু দিয়েই সূর্য বা চন্দ্রের পৃথিবীর উপর যে আকর্ষণ, তাকে প্রতিরোধ করা যায় না। করা যায় না বলে যে কোন দিনই তা করা যাবে না কেভর তা বিশ্বাস করেন না। এমন জিনিস নিশ্চয়ই আছে, বা আবিষ্কার করা যাবে, যার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

কেভর কাগজে কলমে অনেক হিসেবনিকেশ করে প্রমাণ করলেন যে, এমন জিনিস বার করা অসম্ভব নয়। তিনি যে সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমাকে বিষয়টি বুঝালেন, তা

শুনতে খুবই চমৎকার। কিন্তু আমার পক্ষে তা গুছিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

মোট কথা, কেভরের দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েক রকম ধাতু ও হিলিয়াম্ মিশিয়ে এমন একটা মিশ্র ধাতু তৈরি করা সম্ভব, যার একটি পর্দা দুইটি জিনিসের মধ্যে রাখলে তারা পরস্পরের আকর্ষণমুক্ত হবে।

বিজ্ঞানী নিউটনই প্রথম অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই অন্য জিনিসের উপর একটা আকর্ষণ আছে। যে জিনিস যত ভারী, তার আকর্ষণ তত বেশী। তিনি তার নাম দেন মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই আমরা একটা ঢিল ছুড়লে, পৃথিবীর টানে তা মাটিতে ফিরে আসে।

এই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব মুক্ত করার উপায় যদি কেভর বার করতে পারেন, তবে সে যে কি যুগান্তকারী আবিষ্কার হবে, আমি শুধু তাই ভাবতে লাগলাম। এ যে তখন অসাধ্য সাধন করবে। তুমি যদি একটা ভারী জিনিস উঠাতে চাও তবে আর কষ্ট করবার দরকার হবে না। তার নীচে কেভরের আবিষ্কৃত এই জিনিসের একটা পাতলা চাদর রাখলেই হল। তখন একটা কাঠির সাহায্যেই সেই ভারী জিনিসকে উপরে তোলা যাবে। ফলে সব বড় বড় কলকারখানায় এ জিনিসের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার মূল সূত্রই বদলে যাবে। ব্যবসায়ের দিক থেকেও এর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। অমনি আমি মন স্থির করে ফেললাম। আমি জানি, আমি বিষম ঝুঁকি নিতে চলেছি, কিন্তু তবু পিছপা হলে চলবে না।

আমার মন তখন কল্পনার পাখায় উড়ে যাচ্ছে। এ জিনিস আমরা পেটেণ্ট করব। সারা দুনিয়া থেকে এ জিনিসের অর্ডার আসবে, আর আসবে টাকা। সে যে কত টাকা, কল্পনাও করা যায় না।

"আমরা যে কি যুগান্তকারী আবিষ্কার করতে যাচ্ছি, তা হয়ত আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না !" ইচ্ছে করেই আপনি না বলে 'আমরা' বললাম। কেভর তা লক্ষ্যই করলেন না।

আমি আবার বললাম, "আমাকেও আপনার এ কাজে নিতে হবে। এত দিন আপনার তিনজন সহকারী ছিল, এখন থেকে চার-জন হবে। 'না' বললে শুনছিনে।

আমার এ উৎসাহ দেখে কেভর বিস্মিত হলেন। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আপনি ভেবে চিন্তেই বলছেন তো ?"

"তা নয়ত কি ?"

"কিন্তু আপনার নাটক লেখার কি হবে ?"

"চুলোয় যাক নাটক লেখা। আপনি এখনও ঠিক বুঝতে পারছেন না, কি অমূল্য সম্পদ আপনার হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে।"

কেভরের সে ধারণা ছিল না। তিনি ছিলেন আপনভোলা বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানীর মন নিয়েই তিনি এর বিচার করছিলেন। জিনিসটা বার করা সম্ভব। বার করা হলে হয়তো বিজ্ঞান জগতে তা তাঁর নাম অনুযায়ী কেভরাইট বা কেভরাইন নামে পরিচিত হবে। বৈজ্ঞানিক কাগজে তার সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ বেরুবে। ব্যাস্ এই পর্যন্তই। এর বাইরে যে আরও কিছু হতে পারে, তা তাঁর মনেই আসেনি।

এতদিন কেভর বক্তৃতা দিয়েছেন, আমি শুনেছি। আজ পাশা উলটে গেছে। আমি বক্তৃতা করে তাঁকে বলেছি, বৈজ্ঞানিক মহলে কি তুমুল আলোড়ন হবে। তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য হবেন, নোবেল পুরস্কার পাবেন, প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সারিতে তাঁর স্থান হবে।

আর ব্যবসায়-সাফল্য ! এত টাকা হাতে আসবে যে, ইচ্ছে

করলে গোটা পৃথিবীটাই কেনা যাবে। শিল্পজগতে আমাদের ইচ্ছে মত বিপ্লব ঘটবে।

গোড়ার দিকে কেভরের টাকা পয়সা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। কিন্তু আমি তাঁকে তাতিয়ে তুললাম। কেভারাইট কোম্পানির গঠনতন্ত্র কি রকম হবে, তাই নিয়েও আলোচনা হল। তিনি জিনিসটি তৈরি করবেন, আমি তা বাজারে চালু করব।

আমি তাঁকে বারবার বুঝাতে লাগলাম, এমন একটা জিনিস বার করলে, কোন বাড়ি, কোন ফ্যাক্টরী, কোন জাহাজ এ না কিনে পারবে না। এর লক্ষ রকম ব্যবহারে আমাদের হাতে কুবেরের ঐশ্বর্য এসে জমা হবে।

কেভর শান্তভাবে বললেন, "সত্যি, কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে কত নূতন নূতন তত্ত্বই মাথায় আসে।"

"তবে ঠিক লোকের সঙ্গে আলোচনা করা চাই। আপনি ভাগ্যবান্ যে, আপনি উপযুক্ত লোকের সঙ্গেই আলোচনা করছেন।"

"আমার এখন মনে হচ্ছে, টাকার দিকটাও তাচ্ছিল্য করার মত নয়। তবে—।" কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে তিনি থেমে গেলেন।

"তবে আবার কি?" আমি অধৈর্য হয়ে বললাম।

"ব্যাপারটা কি জানেন, হয়তো জিনিসটা আদপে তৈরিই করতে পারলাম না। কাগজে কলমে যা সম্ভব মনে হচ্ছে, কার্যতঃ হয়তো তা অসম্ভবই রয়ে গেল। কিংবা হয়তো সব কিছু করার পরও আবার নূতন বাধা দেখা দিল।"

"ও নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। যখন বাধা আসবে, তখন দেখা যাবে।"

তিন

কেভরের আশঙ্কা যে নিতান্তই অমূলক, সেটা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হল। তারিখটা আমার আজও মনে আছে—১৪ই অক্টোবর, ১৮৯৯।

আর মজা এই যে, ঘটনাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল। কেভর সেদিন বিকালে আমার বাংলোর দিকে আসছেন। আমি স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে বারান্দায় বসে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর বাড়ির চিমনিটা লাফিয়ে আকাশের দিকে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর উড়ল ঘরের ছাদ আর আসবাবপত্র। তারপর দেখা দিল চোখ ঝলসানো আকাশজোড়া বিদ্যুৎশিখা। বাড়ির চারদিকের গাছপালা উড়ে চলল সেই বিদ্যুৎশিখার দিকে। তার পরই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে আমার কানের পর্দা যেন ফেটে গেল।

বারান্দা থেকে নেমে আমি তখন কেভরের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই ঝড়ের মুখে পড়লাম। বাতাসের সে কি বেগ! তার টানে আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কেভরের দিকে উড়ে চললাম। অদূরে কেভরেরও সেই অবস্থা। ঝড়ের মধ্যে তিনিও ডিগবাজি খাচ্ছেন।

যাহোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের বেগ প্রশমিত হল। আমার ধড়েও প্রাণ এল। কেভরও তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সারা শরীরে কাদা, দুহাত কেটে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখে আনন্দের দ্যুতি।

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, "আমায় অভিনন্দন জানান।"

আমি তো হতবাক্। অভিনন্দন!—এই ঝড়ের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, আমি তো ভেবেই পেলাম না।

"আমি পেয়ে গেছি, আমার সাধনা সফল হয়েছে।"

"বলেন কি ? তবে এই বিস্ফোরণটা হল কেন ?"

"এটা বিস্ফোরণ নয়।"

"তবে ?"

কথা বলতে বলতে আমরা দুজনে আমার বাংলোয় এসে পৌঁছলাম। কেভর তখন আমাকে সব কথা ভেঙে বললেন। তিনি নানারকম ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে তা আগুনে পোড়াতে দিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সাত দিন ধরে পোড়াবার পর তাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হবে। ঠাণ্ডা হতে হতে তার তাপ যখন ৬০ ডিগ্রী ফারেনহিটে নেমে আসবে, তখনই তা কেভরাইটে পরিণত হবে। তিনি কেভরাইটকে একটা পাতলা পাতের আকারে তৈরি করেছিলেন। কাজেই যে মুহূর্তে সেটা কেভরাইটে পরিণত হল. অমনি তার উপরের বাতাস বা ছাদের কোন ওজন বা চাপ রইল না। অথচ তার চারপাশের বাতাসে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চে চাপ রইল সাড়ে চোদ্দ পাউণ্ড। ফলে কেভরাইটের উপরের বাতাস আর ছাদ চিমনি সব ওজন হারিয়ে আকাশের দিকে ছুটে চলল। আর চারদিকের বাতাস সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এল। কেভরাইটের পাতের ওপর এসে সেই বাতাসেরও ওজন রইল না। ফলে সে বাতাসও শূন্যে উঠে গেল। আর সেই বাতাসের প্রবল ধাক্কায় বাড়ি ঘর সব ভাঙতে লাগল। এই ভাব যতক্ষণ চলল, ঝড়ও ততক্ষণ চলল। তারপর কেভরাইটের পাতটা যখন বাঁধন-ছাড়া হয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলল, তখন এখানকার ঝড় বন্ধ হল। কিন্তু এর মধ্যেই বাড়ি ঘর দোরের ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

আমি শুনে থ।

কেভর বললেন, "ভাগ্যিস পাতটা উড়ে গেল। নইলে বাতাসের টানে আপনি আমি দুজনকেই বাড়ি ঘরদোরের মতই আকাশে উড়তে হত। তার ফল যে কি হত, সহজেই বুঝতে পারছেন।"

আমি হাঁ করে শুনলাম। শেষে বললাম, "এ তো সর্বনেশে ব্যাপার। এখন তবে আপনি কি করবেন?"

কেভর বললেন, "আপনার আপত্তি না থাকলে আমি এখন বেশ করে চান করব। দেখতেই পাচ্ছেন, সারা শরীরে কাদায় কাদায় কি হয়েছে।…হাঁ একটা কথা। এ ব্যাপারটা যেন আপনি আমি ছাড়া আর কেউ না জানে। আমার বাড়ি তো গেছেই, আরও যে কত লোকের বাড়িঘর ভেঙেছে কে জানে? তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার সাধ্যও আমার নেই। তাছাড়া ক্ষতিপূরণ তারা চাইতেও আসবে না। কেননা, সবাই ভাববে, ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিবাত্যার ফলেই এই কাণ্ড ঘটেছে। আমার যে তিনজন সহকারী ছিল, তারা বেঁচে আছে কিনা জানিনে। বেঁচে থাকলেও তাদের মাথায় এ ব্যাপারটা ঢুকবেই না। আমার তো সব গেছে। এখন আপনি যদি আপাততঃ আপনার বাড়ির একটা ঘর আমাকে ছেড়ে দেন, তবে আবার আমার গবেষণার কাজে হাত দিতে পারি।" এই বলে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, কেভরের সাথে হাত মিলানো মারাত্মক ব্যাপার। এতে যে কোন মুহূর্তে নিজেদের মরণ ডেকে আনা হবে। চাইকি পৃথিবীকেও রসাতলে পাঠানো হবে। কিন্তু আগেই বলেছি, আমার বয়স তখন কম, সব কাজেই তখন বেপরোয়া ভাব। তাছাড়া ব্যবসাপত্র নষ্ট হওয়ায় আমি বেকার। কাজেই শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, কপালে যা থাকে হবে। কেভরকে ছাড়া চলবে না।

কাজেই আমরা দুজনে মিলে আবার পুরাদমে কেভরের ল্যাবরেটরীকে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগলাম। ভাগ্যক্রমে তার সহকারী তিনজনও বেঁচে ছিল। তারাও এসে যোগ দিল।

একদিন কেভর আমাকে বললেন, "এবার আমার মাথায় একটা নূতন বুদ্ধি এসেছে। গতবার আমি ঘরের মধ্যে পাতলা পাতের আকারে কেভরাইট তৈরির চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এবার যদি

কিন্তু আমি তখন মরিয়া। যাকে সামনে পাচ্ছি, তাকেই মারছি

খোলা জায়গায় তা তৈরি করি, তা হলে সেটা সোজা আকাশে উড়ে যাবে। বাড়ি ঘর দোরের কোন ক্ষতি হবে না। শুধু একটা বিকট আওয়াজ শোনা যাবে।”

“কিন্তু এতেই বা কি লাভ হবে?”

“লাভ এই হবে যে, আমিও তার সাথে শূন্যে উড়ে যেতে পারব।”

আমরা চা খাচ্ছিলাম। তাঁর কথা শুনতে আমি চায়ের কাপ হাত থেকে নাবিয়ে রেখে হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

কেভর বুঝিয়ে বললেন, “মস্ত একটা ফাঁপা ইস্পাতের গোলকের কথা ভাবুন। তার ভিতরে কাচের লাইনিং দেওয়া থাকবে। বাইরেটা কেভরাইটের পাতলা চাদর মুড়ে দেওয়া হবে। ভেতরে দুজন লোক আর তাদের জিনিসপত্র ধরে, এমন এক জায়গা থাকবে। বাস্।”

“কিন্তু তার ভিতরে ঢুকবার কি ব্যবস্থা হবে?”

“ও তো সহজ ব্যাপার। গোলকটার গায় এমন একটা ফুটো থাকবে, যার মধ্য দিয়ে আমরা দুজন এবং আমাদের জিনিসপত্র ঢুকতে পারে। আমরা ভিতরে ঢুকে ফুটোটা এমন শক্ত করে বন্ধ করে দেব, যাতে বাইরের বাতাস ভিতরে যেতে না পারে।”

“বুঝতে পারছি। গোলকটা গরম থাকতে থাকতে আমরা ভিতরে ঢুকে ফুটোটা বন্ধ করে দেব। তারপর এটা যখন ঠাণ্ডা হবে, তখনই তার উপর মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাব থাকবে না। ফলে এটা সোজা উপরে উঠতে থাকবে। তাই না?”

“ঠিকই ধরেছেন।”

“আমরাও সোজা উড়ব। কিন্তু তাকে থামাব কি করে? তার দিক পরিবর্তন কি করে করব, পৃথিবীতেই বা আবার ফিরে আসব কি করে?”

“তাও ভেবেছি। বাইরের খোলটা টুকরা টুকরা ইস্পাত দিয়ে এমন ভাবে তৈরী হবে, যাতে ইচ্ছামত তা জানালার খড়খড়ির মত খোলা বা বন্ধ করা যায়। অবশ্য ভিতর থেকে ইলেকট্রিক সুইচ টিপে

এটা করতে হবে। যখন সবগুলি খড়খড়ি বন্ধ থাকবে, তখন এই উড়ন্ত গোলকের ভিতরে আলো, উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ কোন কিছুরই প্রভাব থাকবে না। এটা সোজা উড়তে থাকবে। কিন্তু যেই একটা খড়খড়ি খোলা হল, অমনি ওটা কোন গ্রহের আকর্ষণে সেদিকেই ছুটবে। এভাবে আমরা চাঁদ, মঙ্গল যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারব।"

শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কেভরাইট মোড়া উড়ন্ত গোলকে বসে আমরা সারা সৌরজগৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি! এ যে স্বপ্ন। অথচ এ স্বপ্ন অসম্ভব স্বপ্ন নয়!

আমরা উৎসাহের চোটে তখনই লেবরেটরীতে ঢুকে উড়ন্ত গোলক তৈরীর ব্যবস্থা শুরু করে দিলাম। দিন রাত খেটে মাস তিনেকের মধ্যেই কেভরের পরিকল্পনা মত গোলকটি তৈরী হল। তারপর ঘরের ছাদটি ভেঙে ফেলে, গোলকটির চারদিকে চুল্লী তৈরী হল। তারপর বাইরের দিকে ইস্পাতের গায় কেভরাইটের কলাই লাগান হল।

এদিকে আমাদের সাথে যে সব জিনিস নেওয়া হবে, তা সংগ্রহ করতে লাগলাম। শুকনো খাবার, জল, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, জামা কাপড় আরও কত কি।

বাকী রইল শুধু চুল্লীতে আগুন দেওয়া। শেষে তাও দেওয়া হল। সেই আগুনে গোলকটি গরম হতে লাগল।

আমার মনে তখন সে কি উত্তেজনা! আমরা চাঁদে যাব—সেখানে সোনা রুপা কত কি হয়তো পাব। তাল তাল সোনা নিয়ে যখন ফিরব, তখন আমরা এক এক জন মস্ত বড়লোক! তাছাড়া এতদিন যা কেউ করতে পারে নি, আমরা তাই করব। চাঁদের সমস্ত রহস্যের সব খবর আমরা নিয়ে আসব। পৃথিবীর লোক অবাক্ হয়ে আমাদের কথা শুনবে।

চার

যতখানি গরম করা দরকার গোলকটি ততখানি গরম করা হয়েছে। এবার ঠাণ্ডা করার পালা। গোলকটির উত্তাপ যখন ৬০ ডিগ্রী ফারেনহিটে নামবে, তখনই কেভরাইট তৈরী সম্পূর্ণ হবে, আর গোলকটি মাধ্যাকর্ষণমুক্ত হবে।

আমি সেদিন গোলকটির ফুটো দিয়ে ভিতরে উঁকি মারছি। কিছু দেখা যাচ্ছে না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেভরও পাশে দাঁড়িয়ে। সূর্য অস্ত গেছে, চারদিকে প্রদোষের আঁধার নেমে আসছে।

আমি গোলকটির ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মসৃণ কাচে পা পিছলে গেল। যাহোক, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমি হাত বাড়ালাম, আর কেভর খাবারের বাক্স জলের বোতল ইত্যাদি জিনিস আমার হাতে দিতে লাগলেন।

ভেতরটা বেশ গরম। থার্মোমিটারে দেখলাম ৮০ ডিগ্রী ফারেনহিট। তাপ বিকিরণের কোন সম্ভাবনা নেই জেনে আমাদের পরনে ছিল পাতলা ফ্লানেলের জামা। মোটা উলের জামা ও মোটা কম্বলও আমাদের সাথে নিলাম। বলা যায় না, কখন কাজে লাগবে। সব জিনিস ভিতরে রাখার পর কেভরও ভিতরে ঢুকে ফুটোটি শক্ত করে বন্ধ করে দিলেন। তারপর ইস্পাতের খড়খড়িগুলিও সব বন্ধ করা হল। ভেতরটা তখন একদম অন্ধকার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ রইলাম। তারপর আমিই প্রথম মুখ খুললাম।

"খান দুই চেয়ার না আনাটা ভুল হয়েছে। বসব কিসে?"

কেভর উত্তর দিলেন, "ভুল কিছুই হয়নি। বসার জন্য চেয়ারের কোন দরকারই হবে না। একটু অপেক্ষা করুন, তা হলেই আমার কথাটা বুঝতে পারবেন।"

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি কেভরের সাথে এসে চূড়ান্ত

বোকামি করেছি। এখন নামতে গেলে কেভর আমায় ভীরু মনে করবেন, নইলে আমি নেমে যেতাম। তাই মনে মনে ফুঁসতে লাগলাম।

একটু পরেই একটা ঝাকুনি টের পাওয়া গেল। বোতলের ছিপি খোলার মত সামান্য শব্দও হল।

আমি কেভরকে বললাম, "আমার ভয় করছে। আমি নেবে যাব।"

"তার আর উপায় নেই।"

"আছে কিনা দেখা যাক্।"

"তর্ক করে কোন লাভ নেই। এই যে ঝাঁকুনিটুকু টের পেলে, সেই থেকেই আমাদের এই গোলকটি উড়তে শুরু করেছে। প্রচণ্ড বেগে এ উপরে উঠছে।"

কখন যে আমাদের কথাবার্তা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা দুজনের কেউই লক্ষ্য করিনি।

কেভরের কথা শুনে মনে হল, আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই। আমার মুখে কোন কথা সরল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীরে ধীরে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আমার শরীর যেন হালকা হয়ে গেছে, শরীর আছে কি নেই, তাই যেন বুঝতে পারছি না। আমরা যেন দুই অশরীরী সেই উড়ন্ত গোলকের মধ্যে বসে।

যাহোক, আস্তে আস্তে নূতন পরিস্থিতিটি সয়ে এল। এমন সময় খুট করে শব্দ হল, আর ছোট্ট একটি আলো জ্বলে উঠল। আমি দেখলাম, কেভরের মুখ কাগজের মত সাদা, আমারও নিশ্চয় তাই হবে।

"নড়া চড়া করো না। সারা শরীর এলিয়ে দাও। মনে করো বিছানায় শুয়ে আছ।·· দেখো দেখো, আমাদের ওই জিনিসগুলির দিকে চেয়ে দেখো।"

আমি দেখলাম, যে সব জিনিস আমি গোলকের মধ্যে কাচের মেঝেতে রেখেছিলাম, তারা সব এক হাত উঁচুতে শূন্যে ভাসছে। কেভরও কাচের গায়ে ঠেস দিয়ে নেই। সেও শূন্যে। আমার অবস্থাও তাই।

ব্যাপারটা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন আমাদের শূন্যে ধরে রেখেছে। সব জিনিসটা বুঝতে একটু সময় লাগল। আমাদের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নেই। কাজেই গোলকের ভিতরে যে সব ভারী জিনিস ছিল, তাদের আকর্ষণই আমাদের টানছে।

জীবনে এমন আশ্চর্য অনুভূতি আর কোন দিন হয়নি। কোন বন্ধন নেই, শূন্যে ভাসছি। এ যেন ভূতুড়ে কাণ্ড। মনটা প্রথমে আঁতকে উঠল। আতঙ্ক যখন কাটল, ভাবলাম মজা মন্দ নয়। যেন মোটা পালকের গদির উপর শুয়ে আছি, শরীর এলিয়ে দিয়েছি। এ যেন চাঁদে যাত্রার শুরু নয়, যেন একটা সুখস্বপ্নের শুরু।

এমন সময় কেভর আলোটি নিবিয়ে দিয়ে বলল, "যতটা সম্ভব আলোর অযথা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ পড়াশুনার জন্য আলোর দরকার হবেই।"

আলো নিবৃতেই আবার ঘুটঘুটে আঁধার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি?"

"চাঁদের দিকে যাচ্ছি। একটা খড়খড়ি খুলে দিচ্ছি। তা হলেই দেখতে পাবে।"

খুট করে শব্দ হতেই খড়খড়ি দিয়ে চেয়ে দেখি, বাইরের আকাশ আমাদের গোলকের ভিতরের মতই কালো। কিন্তু সেই নিকষ কালোর মধ্যে উজ্জ্বল তারার মালা। সে যে কি অপরূপ দৃশ্য তা বলে বোঝান শক্ত।

এবার এ খড়খড়িটি বন্ধ হল। আর একটি খোলা হল। সেটি বন্ধ হতেই আর একটি খুলল। সেদিকে চাইতেই চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় আমার দু'চোখ একবারে ঝলসে গেল।

কেভর এবার এক সাথে চারটা খড়খড়ি খুলে দিল, যাতে চাঁদের আকর্ষণ-শক্তি গোলকের ভিতরের জিনিসগুলির উপর কাজ করতে পারে। হলও তাই। আমি দেখলাম, আমরা আর শূন্যে ভাসছি না। যে দিকে চাঁদ, সেই দিকের দেওয়ালে আমরাও লেগে আছি, ভেতরের সব জিনিসও সেদিকেই জড়ো হয়েছে।

আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটল। পৃথিবী থেকে আমরা যখন চাঁদের দিকে চাই, তখন চাঁদ থাকে আমাদের মাথার উপরে। আর এখন আমরা আছি উপরে, চাঁদ আমাদের নীচে। তাছাড়া পৃথিবী আর চাঁদের মাঝে থাকে বাতাসের আস্তরণ, কিন্তু এখানে তা না থাকায় চাঁদের প্রতিটি অংশ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

আমার মনে একটি বিচিত্র প্রশ্নের উদয় হল। আমি কেভরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, পৃথিবী থেকে কি আমাদের এই গোলকটি দেখা যাবে?"

"পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন দিয়েও তা সম্ভব হবে না।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, "এই চাঁদ। এও তো একটা পৃথিবী। এখানকার মানুষ"—

"মানুষ! চাঁদে মানুষ কোথায়? এ তো মরা—বিলকুল মরা। এর বিরাট আগ্নেয়গিরি, লাভাপ্রবাহ, বরফের দেশ, জমাট বাতাস, এর ফাটল, গহ্বর—যেখানে যা কিছু আছে, সব মরা। কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই।"

"তুমি বলছ, চাঁদে কোন প্রাণীই নেই?"

"হয়তো পোকামাকড় থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ বা পৃথিবীর কোন প্রাণীই যে সেখানে নেই, তা জোর করেই বলা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, চাঁদে একটানা চোদ্দদিন দিন, আবার একটানা চোদ্দদিন রাত। কাজেই সেখানকার প্রাণীকেও এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।"

কেভর এ সময় পৃথিবীর দিকের একটা খড়খড়ি খুলে দিল। সঙ্গে

সঙ্গে আমরা সে দিকেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমাদের জিনিসপত্রও লাফিয়ে লাফিয়ে ওদিকেই গেল। আমাদের গোলকও পৃথিবীর টানে সেদিকে ছুটতে লাগল।

কেভর সে খড়খড়িটি বন্ধ করে দিতেই আমাদের উপর পৃথিবীর আর কোন আকর্ষণ রইল না। আমাদের গোলক আবার চাঁদের দিকেই ছুটে চলল।

আমাদের যাত্রার পর অনেকদিন আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন বালাই ছিল না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় আমাদের ওজন অনেক কমে গিয়েছিল, কাজেই কাজ করতেও পরিশ্রম অনেক কম হত। আর কাজই বা কি !

তেমন কোন কাজ হাতে না থাকায়, কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। কাজেই কম্বল বিছিয়ে নাক মুখ মুড়ি দিয়ে আমরা দুজনেই শুয়ে পড়লাম।

এমনি করে দিন কাটতে লাগল। একটু আধটু কথা বলি, একটু আধটু পড়ি, কখনও কখনও সামান্য কিছু খাই। এই ভাবে মহাশূন্যের পথে আমরা ভেসে চললাম। লক্ষ্য—চাঁদে পৌঁছান।

পাঁচ

তারপর একদিন কেভর একসাথে ছয়টা খড়খড়ি খুলে দিল। আর আমার চোখ যেন হঠাৎ আলোর ঝলকে অন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমাদের চারদিকেই তখন চাঁদ। তার পাহাড়ের চূড়াগুলি সূর্যের কিরণে ঝলমল করছে। আর নীচু জায়গাগুলিতে আলো পড়ছে না বলে তা ঢাকা রয়েছে অন্ধকারের কুহেলিকায়। আমরা তখন চাঁদ থেকে একশো মাইলের বেশী দূরে নই। চাঁদের গায়ে আমরা রঙের

বিচিত্র খেলা দেখতে লাগলাম। কোথাও উজ্জ্বল আলো, কোথাও আঁধার, কোথাও বা বাদামী বা সবুজ দৃশ্য। সব মিলিয়ে সে এক বিচিত্র জগৎ, যা এর আগে কোন মানুষ ভাবতেও পারেনি।

কিন্তু এ নিয়ে কাব্য করার তখন সময় নয়। কারণ আমরা তখন আমাদের অভিযানে সবচেয়ে বিপদের মুখে। কি করে চাঁদে নামব, এই আমাদের সমস্যা। আমাদের গোলক যে গতিতে চলছে, সেই গতিতে যদি চাঁদের পাহাড়ে ধাক্কা খায়, তবে সব চুরমার হয়ে যাবে। আমাদেরও চিহ্ন থাকবে না।

আমিও এসব ভাবছি। আর কেভর ব্যস্ত হয়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। এক একটা খড়খড়ি খুলছে, বন্ধ করছে, কি সব আঁকজোঁক কষছে, ক্রোনোমিটার দেখছে। তারপর সে সব কয়টি খড়খড়িই বন্ধ করে দিল। আমরা নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেলাম।

হঠাৎ সে আবার চারটি খড়খড়ি খুলে দিল। সূর্যের আলোয় আমার চোখ ধেঁধে গেল। বুঝতে পারলাম, সূর্যের আকর্ষণ দ্বারা চন্দ্রের আকর্ষণকে প্রতিহত করে আমাদের গোলকের গতিবেগ কমানোই তার উদ্দেশ্য। খড়খড়ি চারটি আবার সে বন্ধ করে দিল। আবার আমরা সীমাহীন অন্ধকারে ভাসতে লাগলাম।

এবার কেভর ইলেকট্রিক আলোটি জ্বেলে দিল। আমরা আমাদের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে বাঁধাছাদা করতে লাগলাম। এও বড় সহজ কাজ নয়। কারণ আমরা তখন শূন্যে ভাসছি। শূন্যে ভেসে থেকে এ কাজ করা যে কি শক্ত, সে শুধু আমরাই জানি। যাহোক শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁধাছাদা শেষ হল। দুটি কম্বল শুধু আলগা রইল। সে দুটি আমরা দুজনে গায়ে জড়িয়ে নিলাম।

এর পর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কেভর চাঁদের দিকের একটা খড়খড়ি খুলে দিল। আমাদের গোলকটি একটা আগ্নেয়গিরির গহ্বরের দিকে নামতে লাগল। এরপর কেভর সূর্যের দিকের একটা খড়খড়িও খুলে দিল। বহুদূরের সূর্য ও একেবারে কাছের চাঁদ, এই দুইয়ের টানে

আমাদের গোলকের গতি কমে এল। এটা ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে এগুতে লাগল।

কেভর আবার দুটি খড়খড়ি বন্ধ করে দিল। তারপর আবার চাঁদের দিকের খড়খড়িগুলি একসঙ্গে খুলে দিতেই একটা প্রচণ্ড শব্দে আমাদের গোলক গিয়ে চাঁদের গুহায় আছড়ে পড়ল। আর আমরা দুজনে কাচের মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। আমাদের জিনিস-পত্রের বাণ্ডিলটি আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। বাইরে দেখা যাচ্ছে শুধু সাদা আর সাদা। যেন বরফের ঢালু বেয়ে আমরা নেমে যাচ্ছি। সে কি মৃত্যুর পথে ?

না, আমরা বেঁচেই আছি। বুঝতে পারলাম, আমরা যে গিরি-গহ্বরে পড়েছিলাম, তারই দেওয়ালের ছায়ায় চারদিক অন্ধকার।

গোলকের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ায় হাত পায়ের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল। কাজেই সামান্য ব্যথা বোধ হচ্ছিল। তা ভুলবার জন্য চাঁদের শোভা দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব দিকেই যে আঁধার। আলোর রেখাও নেই ! এ কি হল ?

কেভর বুঝিয়ে বলল, "আমরা সূর্যোদয়ের আধ ঘণ্টা আগেই চাঁদে এসে পৌঁছেছি। কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।"

সূর্যহীন চাঁদের রাত বিষম ঠাণ্ডা। শীতে যেন আমাদের হাত পা জমে যেতে লাগল। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। ইলেকট্রিক হিটারটিও চালিয়ে দিলাম, যাতে ভিতরটা কিছু গরম হয়।

কেভর প্রস্তাব করল, "এস কিছু খাওয়া যাক। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।"

পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রলোকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা ! আর তারই মাঝে চা খাওয়া ! সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকার কেটে কুয়াশা দেখা দিল। সে কুয়াশাও কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর হয়ে গেল।

ছয়

প্রত্যূষের ধূসর আলোয় আমাদের চোখে ফুটে উঠল চন্দ্রলোকের দৃশ্য। দেখলাম আমরা এক বিরাট গোলাকৃতি রঙ্গমঞ্চের উপর আছি। তার চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের দেওয়াল। অদৃশ্য সূর্যের আলো এসে পড়েছে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ের ধূসর আভা দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা পাহাড় বরফেই ঢাকা রয়েছে।

আমাদের চারধারের পাহাড় বরফের মত সাদা জিনিসে ঢাকা। আমি ভেবেছিলাম, এ বুঝি বরফই। কিন্তু আসলে তা বরফ নয়, জমাট বাতাস।

হঠাৎ চাঁদের দেশে প্রভাত হল। সূর্যের আলো তির্যকভাবে পাহাড়ের গায়ে এসে পড়ল। ক্রমে ক্রমে সে আলো আমাদের দিকেও এগিয়ে এল। সেই আলোর ছোঁয়ায় চার পাশের বরফ গলে বাষ্পের মত উপরে উঠতে লাগল। আর সে বাষ্প ক্রমেই গরম হতে লাগল।

তা দেখে কেভর বলল, "এ যে বাতাস, এতে কোন সন্দেহ নেই। তা নইলে সূর্যের আলোর ছোঁয়ায়ই এত তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে উড়ে যেত না।"

একটু একটু করে বেলা বাড়তে লাগল। পাহাড়ের পর পাহাড়ের গায়ে জমাট বাতাস বাষ্প হয়ে উড়তে লাগল। আমরা অবাক্ হয়ে তাই দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কেভর আমার হাত ধরে বলে উঠল, "দেখ দেখ! সূর্য উঠছে!"

দেখলাম, পূর্বদিগন্তে একটি বাঁকা রক্তরেখা। সেই রেখার উপর অসংখ্য রক্তজিহ্বা যেন এঁকেবেঁকে নাচছে। আর পর মুহূর্তেই সূর্য দেখা দিল।

প্রথমে সূর্যের ক্ষীণ রেখা তারপর সম্পূর্ণ গোলাকার সূর্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর আলো যেন আমাদের চোখে তীরের মত এসে বিঁধল। সেই তীব্র আলোয় আমি চোখে আঁধার দেখলাম এবং হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে কম্বলের নীচে মুখ ঢাকলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই হিসহিস শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের গোলকের চারপাশের জমাট বাতাস গলছে, বাষ্প হয়ে উপরে উঠছে। এ তারই শব্দ।

হঠাৎ আমাদের গোলকটায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। তার পরই সেটা গড়াতে লাগল। যে জমাট বাতাসের উপর এটা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল, তা গলে যাচ্ছে। কাজেই গোলকটাও গড়াচ্ছে। ভিতরে আমরাও হরদম উলটপালট খাচ্ছি। একবার কেভরের সাথে ধাক্কা লাগছে, পরক্ষণেই আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। পৃথিবীর বুকে এই ব্যাপার ঘটলে হয়তো হাত-পা ভাঙ্গত। ভাগ্যিস চাঁদের বুকে আমাদের ওজন পৃথিবীর বুকের ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ, তাই রক্ষা; তাই এই ধাক্কাধাক্কি বা হুমড়ি খেয়ে পড়ার বেগও পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। তবুও একবারে রেহাই পেলাম না। আমার গা গুলোতে লাগল। শেষ অবধি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

যখন মূর্ছা ভাঙ্গল, দেখলাম কেভর আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। যাতে রোদের প্রচণ্ড আলোয় চোখ ঝলসে না যায়, সে জন্য তার এবং আমার দুজনের চোখেই রঙীন চশমা। আমার বমি বমি ভাব তখনও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। আমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, হাত ছড়ে গেছে। কেভর আমার হাতে কপালে কি একটা ঔষধ লাগিয়ে দিল। একটু পরে আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করলাম। আস্তে আস্তে কথাও বলতে পারলাম। কি হয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেভর উত্তর দিল, "আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে।

বাতাসটা সম্পূর্ণ উবে গেছে, অবশ্য যদি এটা বাতাস হয়। চাঁদের গা দেখা যাচ্ছে। এখানে সেখানে মাটিও দেখা দিয়েছে, অদ্ভুত পাথুরে মাটি।"

এই বলে কেভর আমাকে ধরে বসিয়ে দিল, যাতে আমি নিজেও দেখতে পারি।

তাহলে আমরা আর এখন শুধু মহাশূন্যে নেই! আমাদের চারপাশে আছে বায়ুমণ্ডল। এখানে ওখানে নানা আকারের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাটিও চোখে পড়ছে। সূর্যের আলো আমাদের গোলকের ভিতরেও এসে পড়ছে। ভিতরটা বেশ গরম হচ্ছে, অথচ গোলকের নীচে জমাট বাতাস!

এখানে ওখানে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে পাঁশুটে রঙের শুকনো ডাঁটা। এতো বড় আশ্চর্য ব্যাপার। উদ্ভিদের শুকনো ডাঁটা!—এক সময়ে তো এগুলি জ্যান্ত ছিল। তবে কি চাঁদ মরা গ্রহ ছিল না।

আমি অবাক্ হয়ে ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, শুকনো ডাঁটাগুলোর মধ্যে যেন গোল গোল কি সব নড়ছে। আমি যেন আমার চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি কেভরকে ডেকে দেখালাম। কেভরও দেখল। নুড়ির মত গোল জিনিসগুলি শুধু যে নড়ছে তা নয়, সেগুলি যেন ফেটে যাচ্ছে, আর তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে সূর্যের দিকে মাথা তুলছে। একটি নয়, দুটি নয়—এমনি শত শত হাজার হাজার নুড়ি ফেটে যাচ্ছে, অঙ্কুর গজাচ্ছে।

কেভর মন দিয়ে দেখে বলল, "এগুলি হচ্ছে বীজ।" তারপর আপন মনে আবার বলল, "প্রাণের লীলা।"

প্রাণের লীলা! চাঁদে তবে প্রাণীও আছে। আমাদের এ অভিযান তবে শুধু সোনা রুপার বেসাতিতেই শেষ হবে না? জীবের দেখাও হয়তো পাব!

বীজগুলি ফাটতে লাগল। প্রথমে নীচের দিকে একটি শিকড় গজাল, তারপর ছোট্ট কুঁড়িটি সূর্যের দিকে মাথা তুলল। দেখতে দেখতে কুঁড়ি থেকে ছোট ছোট পাতা বেরুতে লাগল। এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের সারা গা সবুজ আর সোনালী চারাগাছে ছেয়ে গেল। এ যেন জাদুর খেলা!

সাত

আমাদের দুজনের মনের মধ্যে একই চিন্তা। এই যে গাছগুলি গজাচ্ছে, বাতাস না থাকলে এটা কিছুতেই সম্ভব হত না। সে বাতাস যত পাতলাই হোক, আমরাও নিঃশ্বাসের সাথে তা নিতে পারব।

আমার সন্দেহ দূর করার জন্য আমি কেভরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা যে বাতাস তা কি করে বুঝব? নাইট্রোজেন বা কার্বলিক এসিড গ্যাসেও তো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে?"

"এটা প্রমাণ করা কিছু কঠিন নয়।" এই বলে কেভর একটা বড় কাগজের টুকরোয় আগুন ধরিয়ে ফুটো দিয়ে তা বাইরে ছুড়ে দিল। আস্তে আস্তে তা জ্বলতে লাগল, কিছু কিছু ধোঁয়াও দেখা গেল। আমার আর সন্দেহ রইল না। চাঁদের বায়ুমণ্ডলে হয় বাতাস, নয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন আছে। কাজেই খুব পাতলা না হলে তাতেই আমাদের বেঁচে থাকা চলবে।

আমি তখন আমাদের গোলকের ফুটোটি খুলতে শুরু করলাম। ভেতরের ভারী বাতাস হুস্ হুস্ করে বাইরে বেরুতে লাগল। কেভর আমাকে বাধা দিল। বাইরে বায়ুর চাপ ভেতরের বায়ুর চাপের চাইতে অনেক কম এটা পরিষ্কারই বোঝা গেল। আমার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল। গোলকের

ভেতরের শব্দ ক্রমেই অস্পষ্ট হতে লাগল। আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হল।

কেভর তখন তাড়াতাড়ি একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার খুলে দিল, যাতে ভেতরের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। তারপর আমাকে কি একটা শরবত তৈরি করে খেতে দিল। আমি একটু সুস্থ বোধ করে আবার গোলকটির ফুটোটি খুলে দিলাম। দেখা গেল, বাইরে চাঁদের যত বরফ জমা হয়ে আছে। কোনদিনই হয়তো সেখানে কারও পা পড়েনি।

কেভর কম্বলটি বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে ফুটোর মুখে গিয়ে বাইরের দিকে পা ঝুলিয়ে বসল। মুহূর্তকাল হয়তো ইতস্ততঃ করল, তারপর চাঁদের মাটিতে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক লাফ দিল।

আমার মনে হল, সে কি বিরাট লাফ! কারণ এক লাফেই সে বিশ ত্রিশ ফুট উপরে একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠল। তারপর আমাকেও হয়তো লাফ দিয়ে তার কাছে যেতে বলল। কিন্তু বাতাস অত্যন্ত হালকা থাকায় তার কথা আমি শুনতে পেলাম না।

কি করব ভেবে না পেয়ে আমিও ফুটো দিয়ে নেমে এলাম। আমার ঠিক সামনেই বরফ গলে একটা নালার মত হয়েছিল। তা পার হবার জন্য আস্তে একটা লাফ দিতেই অবাক্ কাণ্ড! আমি যেন উড়ে চললাম। কেভরের পাশ দিয়ে যেতে আমি পাহাড়ের একটা খাঁজ শক্ত করে ধরে ফেললাম। কেভর চিঁচিঁ করে কি যেন আমায় বলল। আমি ভাল করে বুঝতে পারলাম না।

আমি তখন ভুলেই গিয়েছিলাম যে, চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক-চতুর্থাংশ। চাঁদে আমার ওজন, পৃথিবীতে আমার

যা ওজন, তার ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এখন দেখছি এসব তথ্য ভুলে গেলে চলবে না। যা হোক্ আমি কোনমতে কেভরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের মাথার উপর তখন জ্বলন্ত সূর্য।

যতদূর চোখ যায়, দেখলাম কাঁটাগাছ ঝাড়ে ঝাড়ে বেড়ে চলছে। কোন কোন জায়গায় তা কেয়াগাছের মত। রং গাঢ় লাল। এগুলি এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, মনে হয় গাছগুলি যেন হেঁটে চলেছে।

কেভর বলল, "চাঁদ যেন জনপ্রাণিহীন শ্মশান। এখানে এ যাবৎ কোন প্রাণীর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। না, এখানে এই গাছগুলি ছাড়া জীবন্ত আর কিছু নেই।"

এই বলে কেভর চুপ করল। কি যেন ভাবতে লাগল। আমি অবাক্ হয়ে সেই ক্রমবর্ধমান গাছগুলির দিকে চেয়ে রইলাম। একটা সুন্দর ফুল দেখে কেভরকে তা দেখাব বলে ডাকতে গিয়ে দেখি কেভর সেখানে নেই।

মিনিট খানেক আমি থ হয়ে রইলাম। তারপর আমি কেভরকে খুঁজতে লাগলাম। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাকে ডাকতে শুরু করলাম। কিন্তু উদ্বেগের মুখে ভুলে গেলাম যে, আমরা চাঁদে আছি। তাই পৃথিবীর মত শব্দতরঙ্গ কানে এসে জোরে বাজে না, শুধু মৃদু গুঞ্জন বলে মনে হয়।

আমি তাড়াতাড়ি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কেভরের চিহ্ন নেই। এমন কি আমাদের গোলকটিও দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। আমি যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

যাহোক্ আরও খানিক খোঁজাখুঁজির পর কেভরের দেখা পাওয়া গেল। সে বিশ ত্রিশ ফুট দূরে একটা ন্যাড়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে। আমাকে যেন কি বলছে, শুনতে পাচ্ছি না। মনে হল যেন

আমাকে লাফ দিতে বলছে। বিশ ত্রিশ ফুট এক লাফে পার হওয়া, এ যে অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমি প্রথমটা দ্বিধা করছিলাম। তারপর দিলাম এক লাফ। যেন উড়ে চললাম। আর যেন নীচে নামব না।

ভাবতেও শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। যাহোক আমি কেভরকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে এক ঝোপের মধ্যে পড়লাম। তাই দেখে কেভর ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এল। বলল, "এখানে সব কাজই আমাদের ভেবে চিন্তে করতে হবে। কারণ এখানকার সব কিছুই আলাদা।"

কত জোরে লাফ দিলে কতখানি যাওয়া যাবে, আমরা তারই প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করলাম। খানিকক্ষণ লাফালাফির পর দুজনেরই ব্যাপারটা রপ্ত হল।

বলতে কি, এতে বেশ মজাই লাগছিল। একে তো গোলকের সংকীর্ণ জায়গাটুকু থেকে মুক্তি পেয়েছি, তার উপর চাঁদের বাতাসটি ছিল ভারী মিষ্টি। মনে হল, এতে যেন পৃথিবীর বাতাসের চেয়ে অক্সিজেনের ভাগ অনেক বেশী আছে। সব চাইতে বড় কথা, অজ্ঞাত পরিবেশেও আমাদের দুজনের কারো মনেই কোন ভয়ের উদয় হয়নি।

কিন্তু লাফালাফি করে আমাদের হাঁপ ধরে গেল। আমি তো আমার বুকে রীতিমত ব্যথা বোধ করতে লাগলাম। তাই বুক চেপে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কেভরেরও একই অবস্থা।

এমন সময় হঠাৎ আমাদের গোলকটির কথা মনে পড়ল। কেভরকে বললাম, "আমাদের গোলকটি তো দেখছি না!"

"বল কি?"

দুজন দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তাই তো! গোলকটি কোথায় গেল?

প্রহরীর মুখে এক ঘুষি মারলাম।

আট

কেভরের মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। আমাদের আশেপাশে ঘন আগাছার ঝাড়। আমরা যখন লাফালাফি করছিলাম, তখন যে এগুলি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিল, আমাদের তা নজরেই পড়েনি।

কেভর বলল, "আমার মনে হয় আমাদের গোলকটা আমরা আশেপাশে কোথাও রেখে এসেছি···হয়তো ওই দিকে।"

তার কথায় অনিশ্চয়তার আভাস।

সে আবার বলল, "আমি ঠিক জায়গাটার কথা বলতে পারব না। তবে খুব বেশী দূরেও রেখে আসিনি, এটা ঠিক।"

আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলাম।—উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম—চারদিকেই ঘন ঝোপ। এরই মধ্যে কোথাও আমাদের গোলকটি নিশ্চয়ই আছে। গোলকটি তো যা তা নয়—আমাদের বাড়ি ঘর, এই মহারণ্য থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। তাকে খুঁজে বার করা চাইই চাই।

কেভর হঠাৎ এক দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "আমার মনে হচ্ছে, গোলকটি ওই দিকে আছে।"

আমি বললাম, "তা কেমন করে হবে? আমরা তো ঠিক সোজাসুজি এখানে আসিনি। খানিক দূর এসেই আমরা বাঁক নিয়েছি। কাজেই গোলকটি এখান থেকে পুবদিকে থাকার কথা।"

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি যখন এখানে আসি, সূর্য তখন বরাবর আমার ডান দিকে ছিল।"

"কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে, আসবার সময় আমার ছায়াটা আমার আগে আগে ছিল।"

আমরা হতভম্বের মত পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হল, গিরিগহ্বরের বিশালতা যেন এরই মধ্যে বহুগুণ বেড়ে গেছে।

"কোন একটা চিহ্ন না রেখে আমরা কি বোকামিই করেছি।"

"যা করিনি. তা নিয়ে আপসোস করে লাভ নেই। এখন আমাদের একমাত্র কাজ গোলকটিকে খুঁজে বের করা। যত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাই, ততই মঙ্গল। কারণ রোদের তেজ বেড়েই চলছে। যদি আবহাওয়া এমন শুকনো না হত, তবে এতক্ষণে এই রোদের তাপে হয়তো আমরা মূর্ছা যেতাম। তা ছাড়া আমার যা খিদে পেয়েছে!"

আমি কেভরের মুখের দিকে চাইলাম। বললাম, "তোমার মত আমারও ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

মাথার উপরে রোদ এবং পেটে ক্ষুধা নিয়ে যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় আমরা সেই দিগন্তপ্রসারী পাহাড় ও ঝোপের মধ্যে কত খোঁজাখুঁজি করলাম। আমার খুবই আশা ছিল, যেখানে গোলকটি ফেলে এসেছি, তার কাছের পাহাড় বা ঝোপ দেখলে চিনতে পারব। কিন্তু বৃথা আশা। সর্বত্র একই ধরনের পাহাড়, একই ধরনের ঝোপ, একই ধরনের বরফ। এদিকে রোদের তেজ বাড়তে লাগল, গা জ্বলতে শুরু করল। আমাদের খিদের জ্বালাও বাড়ল। আমরা আরও দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখানে এই প্রথম এমন একটা শব্দ শুনতে পেলাম, যার সাথে এ যাবৎ যে সব শব্দ শুনেছি, তার কোন মিল নেই। অদ্ভুত শব্দ···বুম্ বুম্ বুম্!

মনে হল শব্দটা যেন আমাদের পায়ের তলা থেকে আসছে। আমরা অবাক্ হলাম। ধীর গম্ভীর শব্দ—যেন মাটির নীচে কোন অতিকায় ঘড়ির শব্দ।···বুম্ বুম্ বুম্!

একই সাথে দুজনের মনে একই প্রশ্নের উদয় হল,—এ কিসের শব্দ? ঘড়ির নয় তো?

কেভর আমার হাত চেপে ধরে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারছি যে, আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। ছাড়াছাড়ি চলবে না।"

"এবার আমরা কোন্ দিকে যাব?"

কেভর কোন উত্তর দিল না। মনে হল, আমাদের আশেপাশে যেন অশরীরীর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কেমন? কোথায় আছে? এই জনশূন্য প্রান্তর কি কোন পাতালপুরীর বাইরের দিক? যদি তাই হয়, তবে সেই পাতালপুরীটি কেমন? সেখান থেকে এখনই কি কোন প্রাণী আমাদের আক্রমণ করতে পারে না?

এইরূপ হাজার চিন্তায় মন যখন অস্থির, তখন হঠাৎ বজ্র গর্জনের মত প্রচণ্ড একটা শব্দ আমাদের কানে এল।

আমরা অসহায়ের মত চেয়ে রইলাম। কেভর চুপি চুপি আবার বলল, "আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে। আমাদের একটা লুকোবার জায়গা ঠিক করে রাখতে হয়। কি জানি যদি কিছু ঘটে।"

আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে চলতে লাগলাম। কোথায় যেন একটা বয়লারের গায়ে কেউ হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। গমগম করে আওয়াজ হচ্ছে।

কেভর বলল, "গুড়ি মেরে চল।"

আমরা ঝোপঝাড় সরিয়ে গুড়ি মেরে চলতে লাগলাম। সেই কাঁটাঝোপের একবারে মাঝামাঝি গিয়ে আমি থামলাম।

তখনও সেই বিকট শব্দ বেজেই চলেছে।

"এ সেই পাতালপুরীর শব্দ। মনে হচ্ছে যেন আমাদের পায়ের নীচেই সে শব্দ হচ্ছে!"

"তাহলে তারা এখনই উঠে আসতে পারে।" আমি ভয়ে ভয়ে বললাম।

"তার আগে আমাদের গোলকটি খুঁজে বের করতে হবে।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি করে বার করব?"

"যে পর্যন্ত না খুঁজে পাই, সে পর্যন্ত এভাবেই চেষ্টা করব।"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি তার খোঁজ পাওয়া না যায়?"

"তাহলে লুকিয়ে থাকব। দেখব ওরা কেমন।"

"কোন্ দিকে তবে যাব ?"

"চারদিকই দেখতে হবে।"

আমরা এদিক ওদিক উঁকি মেরে দেখলাম। তারপর খুব সাবধানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গুড়ি মেরে যেতে লাগলাম। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য গোলকটি খুঁজে বের করা।

এদিকে পাতালপুরীর সেই বিকট শব্দ সমানেই চলছে। কোন উঁচু জায়গায় উঠে যে সমস্ত গিরিগহ্বরটিকে ভাল করে দেখব, সে সাহসও হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু যে অশরীরীদের ভয়ে আমরা এতক্ষণ এমন আতঙ্কে কাটিয়েছি, তারা আর এল না। তখন মনে হল, যেন এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

চারদিকের সবই অদ্ভুত। ঝোপঝাড় জুড়ে রোদের ছটা, অথচ আকাশে তারার মেলা। আর থেকে থেকে সেই বিকট গর্জন ? শুনলে কানে তালা লাগে, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে।

এমন সময় দেখি, আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে একপাল অতিকায় জানোয়ার।

নয়

কি জানোয়ার এরা ? বিরাট চেহারা। লম্বায় প্রায় দু'শো ফুট। বেড়ও আশি ফুটের কম নয়। গায়ে সাদা কুচকানো চামড়া। নিঃশ্বাসের তালে তালে সমস্ত শরীরটা এক একবার ফুলে ফুলে উঠছে। মাথাটা ছোট। চোখ দুটি খুদে খুদে। ঘাড়টা মাংসল। নাক আছে কি নেই। মুখ খুলতেই নজরে পড়ে লাল রঙের বিরাট গহ্বর। আমরা ভয়ে মরি, কখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে! আমাদের ভাগ্য ভালো, থপথপ করতে করতে এরা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ এদের গর্জনই আমরা শুনছিলাম।

জানোয়ারের পাল যেই অদৃশ্য হল, অমনি দেখা দিল একজন চন্দ্রলোকবাসী। রাখাল যেমন গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায়, এও তেমনি জানোয়ারদের তাড়া করে চলছে। এই কি তবে চাঁদের মানুষ ?—আর এই তাদের জানোয়ারের দল ?

আমি পা দিয়ে কেভরের পা চেপে ইশারা করলাম। কেভরও তাকে দেখল। আমরা চুপটি করে পড়ে রইলাম, যতক্ষণ না সব জানোয়ারের দল ও চাঁদের মানুষ আমাদের চোখের আড়াল হয়ে অনেক দূরে চলে গেল।

এই যদি চাঁদের মানুষ হয়, তবে চাঁদের জানোয়ারদের তুলনায় সে নেহাতই খুদে। লম্বায় তো পাঁচ ফুটও হবে না। শরীরের গড়ন অনেকটা পোকার মত। গা থেকে কয়েকটা সরু শুঁড় বেরিয়েছে, হাত দুখানা লিকলিকে লম্বা। পরনে চামড়ার পোশাক, তাতে সারা শরীর ঢাকা। মাথায় খাড়া খাড়া শলা বসানো টুপি। মুখে মুখোশ, চোখে কালো চশমা। পা দুটি সরু খাটো, গরম মোজা পরা।

আমরা পরে দেখেছিলাম, চন্দ্র-মানুষ তার টুপির শলা দিয়ে চাঁদের জানোয়ারদের খোঁচা মেরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই প্রথম দেখা মানুষটির ভাব দেখে মনে হল, যেন সে রেগে আছে। যেন তাড়াহুড়া করে কোথাও যাচ্ছে। তার হাত দুটি দুলছে, আর তাতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি আর চাঁদের মানুষটি চোখের আড়াল হতে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ একটি জানোয়ারের করুণ অথচ তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। তারপরই সব চুপচাপ।

এর পর যখন আবার চাঁদের দেশের জানোয়ারদের দেখা পাওয়া গেল, তখন তারা মাঠের সবুজ গাছ খাওয়ায় ব্যস্ত। সে খাওয়ারই বা কি বহর ! গোগ্রাসে খাচ্ছে, ঘোঁত ঘোঁত শব্দ হচ্ছে। তাদের আকৃতিই বা কি বিশাল আর কুৎসিত !

গহ্বরের ভিতরটা উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম। নীচে গহ্বরের ভিতরে খুব জোরে হাওয়া বইছে মনে হল।

প্রথমে মসৃণ দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তারপর অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে চোখ যখন খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন নীচে কয়েকটি অস্পষ্ট আলোকবিন্দু চোখে পড়ল। কারা যেন তার মধ্যে নড়াচড়া করছে।

আমি কেভরকে এর রহস্য কি জিজ্ঞাসা করলাম।

কেভর বলল, "ওগুলি বোধহয় এঞ্জিনের আলো। রাতে তারা এই গহ্বরের মধ্যে থাকে, দিনে উপরে উঠে আসে।"

"তারা কি মানুষ?"

"যেটিকে দেখেছি, সেটি নিশ্চয়ই মানুষ নয়। এরা মানুষ কিনা, সে গবেষণার আগে আমাদের গোলকটি খুঁজে বার করতে হবে।"

আমরা ফের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করলাম। আমাদের মনে তখন এক সংকল্প, গোলকটি বার করা চাই। কিন্তু ক্রমেই আমাদের গতি শ্লথ হয়ে এল। আমি তো একেবারে ভেঙেই পড়লাম। পেটে কিছু না পড়লে আমি যে আর এক পাও যেতে পারব, এমন ভরসা আর রইল না। সে কথা কেভরকে বললাম।

কেভর একটু বিরক্ত হয়ে আমার দিকে চাইল। বলল, "বেডফোর্ড, এমন অধৈর্য হলে চলবে কেন?"

"আমার ঠোঁট দুটি দেখ। একবারে শুকনো। আর পারছি না।"

"আমার বুকও অনেকক্ষণ থেকেই তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে।"

"এ সময় যদি বরফের চাইগুলি এখানে থাকত।"

"সেসব কখন গলে শুকিয়ে গেছে। ও ভাবনা করে লাভ নেই। এখন শুধু গোলকের কথা ভাব।"

আবার আমরা শেষ শক্তি দিয়ে হামাগুড়ি দিতে লাগলাম। আমার মনে তখন শুধু এক চিন্তা, কোথায় কিছু খাবার মিলবে। অন্ততঃ একটু জল খেতে পাব।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চুপি চুপি যেতে যেতে আর এক দল জানোয়ারের দেখা মিলল। বেশ বড় দল। আমরা আবার দম বন্ধ করে ঘুপটি মেরে রইলাম। তারাও চলে গেল। আমরাও আবার এগোতে লাগলাম।

এবার আমরা একটা গোলাকার খোলা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। জায়গাটার ব্যাস প্রায় ত্নশো গজ। এমন খোলা জায়গা দিয়ে যেতে স্বভাবতঃই আমাদের খুব ভয় ভয় করতে লাগল। তাই আমরা চার-দিকে বেশ ভাল করে নজর রেখে চলতে লাগলাম

এতক্ষণ কোন শব্দ ছিল না। এবার শুরু হল সেই বিকট আওয়াজ। যেন কোন যন্ত্রদানবের গর্জন। আমরা জায়গাটার এক ধার ঘেঁসে হাঁটতে শুরু করলাম।

আবার কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরই হঠাৎ বজ্রনির্ঘোষ। এত কাছে এবং এত জোর শব্দ আমরা এর আগে এখানে কখনও শুনিনি। মনে হল যেন সে শব্দে সমস্ত চন্দ্রলোক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

কেভর আমাকে বলল, "ব্যাপার স্থবিধের মনে হচ্ছে না। এস আমরা জঙ্গলের মধ্যে লুকোই।"

আবার সেই বজ্রনির্ঘোষ। তারপরই এক অদ্ভুত কাণ্ড। সেই খোলা জায়গাটা আস্তে আস্তে একদিকে সরে যেতে লাগল। নীচে দেখা দিল অতলস্পর্শ বিরাট গহ্বর।

কেভর না থাকলে আমি হয়তো সেই গহ্বরে পড়ে একবারে পিষে যেতাম। কিন্তু যেই জায়গাটা সরতে শুরু করল, অমনি কেভর আমাকে এক টানে সরিয়ে নিল। আমরা সেই চলন্ত জায়গাটার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকলাম।

ত্নজনেই হাঁপাতে লাগলাম। ত্নজনের শরীরই থরথর করে কাঁপছে। ত্নজনেই বেশ কিছুক্ষণ মরার মত পড়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে মনে সাহস ফিরে এল। আমরা অতি সন্তর্পণে সেই

যেতে যেতে আমরা একটা সমতল জায়গায় এলাম। এখানে ঝোপঝাড় কম। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত লাল রঙের উদ্ভিদ্। হাত দিয়ে টানতেই একটা ভেঙে গেল। ভিতরটা দেখে মনে হল, এটা হয়তো খাওয়া যেতে পারে। গন্ধটাও চমৎকার। আমি একটা টুকরা নাকের কাছে ধরে শুঁকতে লাগলাম।

কেভরকে বললাম, "একটু খেয়ে দেখি?"

কেভর আমাকে সাবধান করে বলল, "সর্বনাশ, ও কাজটি করো না।"

তার কথা শুনে আমি ওটা হাত থেকে ফেলে দিলাম এবং তার সাথে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম।

কিন্তু পেটে অসহ্য ক্ষুধা, দেহে অপরিসীম ক্লান্তি, আশেপাশে এই সুগন্ধি উদ্ভিদের আমন্ত্রণ! আমি আর সামলাতে পারলাম না। কেভরকে বললাম, "তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?"

"এগুলি হয়তো বিষ।"

"কিন্তু আর যে পারছি না। অল্প একটু খেয়ে দেখি!" এই বলে কেভর বাধা দেবার আগেই আমি একটা ছত্রাক ভেঙে মুখে পুরলাম। খেতে বেশ ভালই লাগল। বললাম, "চমৎকার স্বাদ।"

কেভর আমার খাওয়া দেখল। তারপর সেও আর লোভ সামলাতে পারল না। তখন দুজনে পেট ভরে সেই ছত্রাক খেলাম। দেখতে দেখতে শরীর গরম হয়ে উঠল। ক্লান্তিও দূর হল। মাথার মধ্যে নানা এলোমেলো চিন্তা শুরু হল।

পৃথিবীতে লোকের থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই। এ যে অপূর্ব জায়গা! খাওয়ারও এমন চমৎকার সহজ ব্যবস্থা! একবার সবাইকে নিয়ে এলেই হয়!

মনের মধ্যে তখন এসব কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। অন্য সব ভয় তখন দূরে গেছে। চন্দ্রলোকের অদ্ভুত মানুষ, অদ্ভুত জানোয়ার, বিকট শব্দ, চলন্ত খোলা জায়গা—সব একদম ভুলে গেলাম। মাথাটাও

যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। আমি ভাবলাম, অনেকক্ষণ বাদে পেটে খাবার গেছে, তাই বোধহয় এই ঝিমঝিমানি।

কেভরকে বললাম, "তোমার এ আবিষ্কার চমৎকার!"

"কি বলছ? চন্দ্রলোক আবিষ্কার?"—কেভর ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জবাব দিল।

আমি তার কথা শুনে চমকে উঠলাম। তার কথা জড়ানো অস্পষ্ট। আমার মনে হল, লাল ছত্রাক খেয়ে কেভরের নেশা হয়েছে। তা ছাড়া সে চন্দ্রলোক আবিষ্কার করেছে, এ ধারণাও ভুল। সে তো চন্দ্র আবিষ্কার করেনি, সে শুধু এখানে এসে পৌঁছেছে। আমি তাকে এ কথাটা বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে কিছুতেই তা বুঝতে চাইল না। আমারও মনে হল, আমিও যেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমার পরিষ্কার মনে নেই, কিন্তু আমার মাথার মধ্যে চন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপনের কল্পনাই কেবল ঘুরতে লাগল। কেভরকে বললাম, "চন্দ্রলোক আমাদের দখল করতেই হবে। এ এমন একটি সাম্রাজ্য, যা সম্রাট্ সিজারও কল্পনা করতে পারেননি। আমি এদেশের নাম দেব কেভরেসিয়া, কিংবা বেডফোর্ডেসিয়া। একটা কোম্পানি খুলব —বেডফোর্ডেসিয়া লিমিটেড। নামে লিমিটেড, কিন্তু আমাদের এই সাম্রাজ্য হবে আন্‌লিমিটেড—যার শেষ নেই।

এ ছাড়া আরও কত কি ভেবেছিলাম, মনে নেই। শুধু ভাসা ভাসা মনে পড়ছে, আমরা খুব হাঁকডাক করে বলছিলাম যে চন্দ্রলোকের এই কীটদের আমরা থোড়াই ভয় করি, এদের ভয়ে লুকিয়ে বেড়ানোরও কোন মানে হয় না, আমাদের সামনে যখন এতগুলি ছত্রাক রয়েছে, তখন আর কোন ভাবনা নেই। এই বলে জঙ্গল ছেড়ে আমরা রোদের আলোয় এলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই দুজন চাঁদের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। একজনের পিছনে আর একজন, এই ভাবে তারা মার্চ

করে চলছে, আর ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। আমাদের দেখেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য আমি যেন আমার সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

কেভর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "পোকামাকড়ের দল। তারা ভাবছে, তাদের ভয়ে আমরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছি!"

এই বলে সে এক লাফে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তার লাফটা একটু বেশী হয়ে গেল। চন্দ্রলোকে যে মাধ্যাকর্ষণ অনেক কম—পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ—এ কথাটা সে বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। তাই সে তাদের ডিঙিয়ে গিয়ে একটা ফণীমনসার ঝোপে পড়ল। চন্দ্র-মানুষরা কি ভাবল, তারাই জানে। আমি দেখলাম তারা যে যার মত ছুটে পালাচ্ছে। আমিও কেভরের কাছে যাবার জন্য লাফ দিতেই একবারে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। তারপর জ্ঞান হারালাম। আমার মনে হল, আমি যেন কার সাথে ধস্তাধস্তি করছি। কে যেন আমাকে সাঁড়াশির মত হাত দিয়ে চেপে ধরছে! আমায় মারছে, শিকল দিয়ে বাঁধছে। আমার সারা শরীর যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে আমার মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমরা যেন কোন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।

দশ

যখন জ্ঞান হল, দেখলাম চারদিকে শুধু অন্ধকার। আর কানে এল গোলমালের শব্দ। এ কোথায় আছি? কেমন করে এখানে এলাম? কিছুই বুঝতে পারলাম না, শুধু টের পেলাম, একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছে।

কেভরকে বললাম, "একটা আলো না হলে যে চলছে না।"

কোন উত্তর পেলাম না।

আবার আলোর কথা বললাম। এবার কেভরের গলা শোনা গেল। একটা গোঙানি—"আমার মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

আমার মাথায়ও তখন অসহ্য ব্যথা। আমি হাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরবার চেষ্টা করতেই টের পেলাম, আমার দুটি হাতই এক সাথে বাঁধা। আমি চমকে উঠলাম। কে আমায় বাঁধল? হাত দুটি মুখের উপর ছোঁয়াতেই টের পেলাম—সে দুটি শিকল দিয়ে বাঁধা। পা নাড়তে গিয়ে দেখি, সে দুটিও শিকলে বাঁধা। কোমরেও শিকল। নড়াচড়ার উপায় নেই।

আমি ভয় পেলাম। খানিকক্ষণ হাত পা নাড়াতে চেষ্টা করলাম। তারপর চিৎকার করে কেভরকে বললাম, "আমার হাতে পায়ে শিকল —তুমি এ ভাবে আমায় বেঁধেছ কেন?"

"আমি বাঁধিনি। এ চাঁদের মানুষদের কাণ্ড। আমারও তোমারই মত অবস্থা।"

চাঁদের মানুষ! তাই তো! একটু একটু করে সব কথাই মনে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেভর, আমরা এখন কোথায়?"

"কেমন করে বলব?"

"আমরা বেঁচে আছি তো?"

"কি বাজে বকছ?"

"তবে আমরা তাদের হাতে ধরা পড়েছি?"

কেভর কোন উত্তর দিল না।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কি করবে?"

"কি করে বলব?"

দুজনেই চুপ করে গেলাম। আমাদের কানে আসতে লাগল অস্পষ্ট শব্দ—যেন দূরে কোন কলকারখানা চলছে। এ যে কিজন্য হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু একটু বাদেই কানে এল অন্য আর এক রকম শব্দ। এবার সে শব্দ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ। তারপর সেই অন্ধকারে দেখা দিল সরু অথচ উজ্জ্বল আলোকরেখা।

কেভর চাপা গলায় বলল, "দেখছ ?"

"এ কিসের আলো ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানি না।" কেভরের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আমরা আলোর শিখার দিকে চেয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে সেটা বড় হল ; তারপর সেটা নীলাভ হল। অমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঘাড় কাত করে যতটা সম্ভব দেখবার চেষ্টা করলাম। কেভরকে বললাম, "পিছন থেকে আলোটা আসছে।"

যে ফাঁক দিয়ে আলোটা আসছিল, হঠাৎ সেটা চওড়া হয়ে গেল। কেউ যেন একটা দরজা খুলে দিল। আর তারই ফাঁক দিয়ে দূরে নীলাভ আলো দেখা গেল। সেই আলোয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে —এক অদ্ভুত মূর্তি।

চাঁদের মানুষের মতই তার শরীর কৃশ, পা-দুটি খাটো, তবে মাথার টুপিটা নেই, আর নেই, শরীরে কোন পোশাক-পরিচ্ছদ। নিঃশব্দে তিন পা এগিয়ে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর পাখির মত পা ফেলে এগিয়ে এল।

এসেই আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। উজ্জ্বল আলো তার মুখে পড়ছে। কী বীভৎস মুখ ! মুখ তো নয় যেন একটা মুখোশ। তার নাক নেই, কান নেই, কপালের দু'পাশে দুটো ড্যাবড্যাবে চোখ যেন ঝুলে পড়ছে। মুখ একটা আছে বটে, সে মুখও নীচের দিকে ঝুলে পড়া। কাঁকড়ার পায়ে যেমন গিঁট থাকে, গলায় তেমনি তিনটি গিঁট।

এ যেন এক জীবন্ত বিভীষিকা ! সে তার ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার এই চাউনি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সেও হয়তো আমাদের দেখে আমাদের চাইতেও বেশী অবাক্ হল। তবে তার ভাবলেশহীন মুখে তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

আর আমাদের অবস্থা ! আমাদের হাত-পা বাঁধা, নড়াচড়ার

ক্ষমতা নেই। দুজনেরই দেহ ক্লান্ত, দুজনেরই পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা। মুখে দু ইঞ্চি লম্বা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গিয়ে লাল হয়ে রয়েছে। কেভরের ট্রাউজার ছিঁড়ে গেছে, তার চুল উস্কোখুস্কো। আমার অবস্থাও তাই। আমাদের পা খালি। জুতা খুলে রাখা হয়েছে। আমরা আলোর দিকে পিছন দিয়ে বসা, আর আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই জীবন্ত বিভীষিকা—চাঁদের মানুষ!

কেভরই প্রথম মুখ খুলল। কিন্তু কথা বলতে গিয়েও পরিষ্কার কিছু বলতে পারল না। গলাটা পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করল।

এমন সময় বাইরে চাঁদের জানোয়ারের বিকট চিৎকার। আর্তনাদ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা থেমে গেল। আবার সেই মৃত্যুর স্তব্ধতা।

চাঁদের মানুষটি তখন ঘুরে দাঁড়াল, দরজার কাছে খানিক অপেক্ষা করল, তারপর তা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার আমরা সেই সীমাহীন অন্ধকারে ডুবে গেলাম।

এগার

কিছুক্ষণ আমাদের কারও মুখেই কোন কথা ফুটল না। কি যে আমাদের অবস্থা তা যেন আমরা বুঝতেই পারছিলাম না।

শেষে আমিই বললাম, "তাহলে শেষ পর্যন্ত এদের হাতেই ধরা পড়তে হল!"

"সে তো তোমার জন্যই। তুমি সেই লাল ছত্রাকগুলি খেতে শুরু না করলে এমনটি হত না।"

"বাজে কথা বলো না। কিছু না খেলে খিদের জ্বালায়ই অজ্ঞান হয়ে পড়তাম।"

"তার আগেই হয়তো আমাদের গোলকটি খুঁজে পেতাম।"

তার কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। রাগের চোটে তার সাথে কোন কথাই বললাম না। কিন্তু কতক্ষণই বা এমন চুপচাপ থাকা যায়!

তাই আবার নরম গলায় বললাম, "কেভর তোমার কি মনে হচ্ছে, বলো তো।"

"আমার তো মনে হয় এদের বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তারা নানা জিনিস তৈরি করতে পারে, কাজ করতে পারে, ওই যে আলো দেখছ—"

বলতে বলতে সে থেমে গেল: স্পষ্টই মনে হল, কি যে বলবে, সে নিজেই তা বুঝতে পারছে না। তারপর আবার বলল, "আমার মনে হয় চাঁদের পিঠ থেকে আমরা হাজার দুই ফুট কিংবা তারও বেশী নীচে আছি।"

"কি করে বুঝলে?"

"দেখছ না, জায়গাটা কেমন ঠাণ্ডা। তা ছাড়া আমাদের কথাবার্তাও বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সুতরাং এখানকার বাতাস বেশ ভারীই হবে। আমরা বোধহয় চাঁদের পিঠ থেকে প্রায় মাইল খানেক নীচেই আছি।"

"আমাদের গোলকটির কি হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?"

"হয়তো হারিয়ে গেছে।" কেভর নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

"সেই ঝোপঝাড়ের মধ্যেই কোথাও আছে তবে?"

"যদি না ওরা তার সন্ধান পেয়ে থাকে!"

"আর যদি ওদের নজরে পড়ে থাকে?"

"আমি কি করে বলব?"

আমি আমার বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না। একটু তিক্ত স্বরেই বললাম, "কত আশা করেছিলাম, একটা কোম্পানি গড়ব। কত টাকা রোজগার করব! হায় ভগবান্—কি ভাবলাম,

আর কি হল ! এই অন্ধকারে পচে মরবার জন্যই কি এত পরিশ্রম করলাম ? চাঁদে আসার প্রস্তাব না করলে কেভরাইট অন্য কত লাভের কাজে লাগান যেত ।"

কেভর কোন উত্তর দিল না। আমিও আর তার সাথে কথা বললাম না। কেভর আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগল—"তারা যদি আমাদের গোলকটা দেখতেও পায়, তাহলে কি করবে ? খুব সম্ভব তারা তার কলকবজা বুঝবে না। এটা বুঝবার মত বুদ্ধি যদি তাদের থাকত, তবে অনেক দিন আগেই তারা পৃথিবীতে অভিযান চালাত। কিন্তু তারা বুদ্ধিমান্, নূতন জিনিস জানবার আগ্রহও তাদের আছে। তারা নিশ্চয়ই এর কলকবজা পরীক্ষা করবে, এর ভিতরে ঢুকবে, এটা সেটা নাড়াচাড়া করবে। সুইচগুলি টিপবে। তাহলেই তো সেটা মহাশূন্যে উড়তে শুরু করবে। তার ফল, চির-জীবন আমাদের এই চাঁদের দেশেই কাটাতে হবে।"

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। চিৎকার করে বললাম, "তোমার মত মাথাপাগলার পাল্লায় পড়েই আমাদের এ দশা !"

কেভর শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—"ভুলে যেও না বেডফোর্ড, স্ব-ইচ্ছায়ই তুমি আমার সাথে এসেছ। তা ছাড়া এখন এ নিয়ে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। এরা আমাদের হাত পা বেঁধে রেখেছে। যতই চেঁচামেচি কর, ফল কিছু হবে না। আমাদের আরও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় বাকী আছে। এ সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার।"

"চুলোয় যাক্ তোমার অভিজ্ঞতা।"

কেভর চুপ করে রইল। তার পর আপন মনেই বলল, "এদের সাথে বোঝাপড়া দরকার। আমাদের মনোভাব এদের কি করে বোঝাই, এই হচ্ছে সমস্যা। হাত পা নেড়ে ? ইঙ্গিতে ? মানুষ আর বানর ছাড়া ইঙ্গিত বোঝার ক্ষমতা আর কারও নেই। এরা তো

কথা বলতে পারে। অবশ্য এদের কথার ধরন আলাদা—জোর শিস দেওয়ার মত শোনায়। আমরা যে কি করে তার অনুকরণ করব, বুঝতে পারছি না। এটা কি তাদের কথা বলার ধরন—না অন্য কিছু? তাদের বুদ্ধি হয়তো অন্য রকম, তাদের কথা বলার কায়দা হয়তো আলাদা। তবে তাদের যখন মন আছে, বুদ্ধি আছে, তখন তাদের সাথে আমাদের কোন না কোন বিষয়ে মিল হবেই। কাজেই তাদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া একভাবে না একভাবে করতে পারবই।"

"অসম্ভব। এদের সঙ্গে আমাদের কোন মিলই নেই। কাজেই এই বাজে চিন্তায় কোন লাভই হবে না।"

কেভর ভাবতে লাগল। শেষে বলল, "তোমার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী হলেও তাদের সাথে কোন না কোন একটা বিষয়ে মিল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

"এরা তো মানুষ নয়। জানোয়ার। জানোয়ারও নয়—এদের বরঞ্চ পিঁপড়ে বলা যায়। তফাত শুধু এরা দু'পায়ে হাঁটে। পিঁপড়ের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়া কে কোন্ দিন শুনেছে?"

"কিন্তু এদের যন্ত্রপাতি, এদের পোশাক-পরিচ্ছদ? না বেডফোর্ড, তোমার সাথে আমি একমত হতে পারছি না।"

বোকার মত তার এই কথায় আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সব বিষয়েই আমিও কি বোকামিই না করেছি! আমিও একটা গাধা। নইলে গোলকটিকে ছেড়ে এভাবে নেমে পড়া কেন? অন্ততঃ বুদ্ধি করে যদি একটা রুমাল বা অন্য কোন চিহ্নও রেখে আসতাম, তাহলে আজ আমাদের এই দুরবস্থা হত না।

কেভর নিজের ভাবেই ছিল। সেই সুরেই সে বলল, "এরা যে বুদ্ধিমান্ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতক্ষণেও যখন আমাদের মেরে শেষ করেনি, তখন নিশ্চয়ই এদের দয়া-মায়াও আছে।

প্রচণ্ড বেগে গোলাটি উপরে উঠছে

তা ছাড়া এই যে শিকল, যা দিয়ে আমাদের বেঁধেছে তারই বা কি গঠন-নৈপুণ্য।"

তার কথা শুনে আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হল। কেন আমি চারদিক ভাল করে ভাবিনি? কেন তার উপর এমন অন্ধ বিশ্বাস করেছিলাম? কেন নাটক লেখা নিয়েই রইলাম না? এত দিনে তো আমার নাটকটা শেষ হয়ে যেত। নাটকের কাঠামো তো তৈরীই ছিল। সে সব ছেড়ে কিনা শেষে চাঁদে অভিযান! বোকামি আর কাকে বলে!

আমি এসব ভাবছি, এমন সময় দেখি, অন্ধকার ভেদ করে আবার সেই নীলাভ আলোকরেখা ফুটে উঠছে। দরজাটাও খুলে যাচ্ছে, এবং জনকয়েক চাঁদের মানুষ নিঃশব্দে আমাদের ঘরে ঢুকছে। তাদের বীভৎস আকৃতি দেখে আমি হাঁ করে রইলাম।

প্রথম দুজনের হাতে, মানে শুঁড়ে, দুটি বাটি। তাতে সাদা সাদা কি যেন আছে। এমনিই ভীষণ খিদে পেয়েছিল। সামনে খাবার দেখে সে খিদে যেন আরও বেড়ে গেল। একজন আমার সামনে একটি বাটি রাখল। আমি দেখলাম, তার হাত আমাদের মত নয়, হাতির শুঁড়ের আগার মত খানিকটা থলথলে মাংস মাত্র।

বাটি থেকে ব্যাঙের ছাতার মত গন্ধ আসছে। হয়তো চাঁদের বাছুরের মাংস। দেখে জিভে জল গড়াতে লাগল। কিন্তু সামনে খাবার পেয়েও খাবার উপায় নেই। কারণ দু হাতই বাঁধা। তাই দেখে তারা আমার একটি হাতের বাঁধন খুলে দিল। আর অমনি আমি হাভাতের মত খেতে শুরু করলাম। খেতে খারাপও লাগল না।

কেভরও খেতে শুরু করল। জীবনে আর কোন দিন এত খিদে পেয়েছিল, বা এত তৃপ্তি সহকারে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখল, তারপর নিজেদের মধ্যে তাদের ভাষায় কি সব বলাবলি করতে লাগল।

বার

আমাদের খাওয়া শেষ হলে চাঁদের মানুষগুলি আমাদের হাত আবার শক্ত করে বাঁধল। তবে পায়ের বাঁধন কিছুটা আলগা করে দিল, যাতে আমরা একটু নড়াচড়া করতে পারি। আর কোমরের বাঁধন একেবারেই খুলে দিল।

এভাবে আমাদের বাঁধন আলগা করে দিয়ে তারা খানিকটা দূরে গিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখতে লাগল। নিজেদের মধ্যে পাখির মত ভাষায় কথাবার্তাও বলতে লাগল। ইতিমধ্যে আমাদের পিছনের দরজাটা আরও ফাঁক হল। দেখলাম, অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ কিছু চাঁদের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

"তারা কি চায়, আমরাও তাদের মত কথা বলি?"—আমি বললাম।

"আমার তা মনে হয় না।"

"আমার মনে হচ্ছে, তারা যেন আমাদের কি একটা বোঝাতে চায়।"

"আমি তো ইঙ্গিত-ইশারা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এমন সময় বেঁটে অথচ বেশ মোটাসোটা একজন চাঁদের মানুষ আমাদের কাছে এগিয়ে এল, হঠাৎ কেভরের পাশে বসল, আবার তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল।

ইঙ্গিতটা আমি বুঝতে পারলাম। কেভরকে বললাম, "তাদের ইচ্ছে আমরা উঠে দাঁড়াই।"

কেভর হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, "তাই, তো! ঠিকই ধরেছ।"

আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম। চাঁদের মানুষরা কি যেন বলল, তারপর, সেই বেঁটে মোটা মানুষটি তার শুঁড় আমাদের গালে বুলিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোতে লাগল। আমরা এ ইঙ্গিতও বুঝে নিলাম এবং তাকে অনুসরণ করলাম।

দরজার কাছে চারজন পাহারাদার ছিল। তাদের মাথায় ছিল কাঁটা বসানো টুপি, হাতে ছিল ডাঙ্গশ। যেই আমরা বন্দিশালা থেকে বেরুলাম, অমনি তারা আমাদের দুজনের দুপাশে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে আমরা থ হয়ে গেলাম। দেখি বিরাট এক কারখানা। সেখানে কত যন্ত্রপাতি, তার জটিলতাই বা কত! সব যন্ত্রগুলিই চলছে। আর তারই বিকট আওয়াজ হচ্ছে। এতক্ষণ আমরা এই আওয়াজই শুনছিলাম। যে নীলাভ আলো আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম, তার উৎসও এখানে। জলস্রোতের মত ঠাণ্ডা তরল আলোর ধারা বয়ে চলছে, আর চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, যন্ত্রপাতিগুলি বেশ বিরাট। কিন্তু সে যে কি বিরাট, সে ধারণা করতেও খানিকটা সময় লাগল। তাদের তুলনায় চাঁদের মানুষদের পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছিল। এই খুদে মানুষের বুদ্ধিতে এই বিশাল যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হয়েছে, ভাবতেও এদের সম্বন্ধে মনে নূতন করে সম্ভ্রম জাগল।

কেভরের দৃষ্টিতেও বিস্ময়। "আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। পৃথিবীর মানুষ কখনও এত বড় যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারত না।"—কেভর বলল।

বেঁটে মোটা চাঁদের মানুষটি আমাদের পিছনে ফেলে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। সে পিছিয়ে এসে আমাদের ও যন্ত্রগুলির মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর আবার চলতে শুরু করল। আমরা তার পিছু পিছু যাচ্ছি না দেখে সে ফিরে এসে আমাদের গায়ে আস্তে আস্তে ঠেলা মারল।

কেভর ও আমার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। আমি বললাম, "আমরা এই যন্ত্রগুলি একটু ভাল করে দেখতে চাই, একথাটা কি একে বোঝান যায় না?"

"দেখি চেষ্টা করে।" এই বলে কেভর চাঁদের মানুষটির দিকে চেয়ে একটু হাসল। তারপর আঙ্গুল দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলি দেখাল।

চাঁদের মানুষগুলি পরস্পরের দিকে তাকাল, মাথা নেড়ে কি বোঝাতে চাইল, শেষে পাখির মত কিচিরমিচির করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল।

তারপর দলের মধ্যে যে একটু লম্বা, সে হঠাৎ তার শুঁড় দিয়ে কেভরের কোমর জড়িয়ে ধরল এবং আমাদের যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল, তার দিকে টানতে লাগল।

কেভর এক পাও নড়ল না। বলল, "এরা বোধ হয় আমাদের জানোয়ার বলেই ভাবছে। আমরা যে তা নই, তা এদের বুঝান দরকার।"

এই বলে সে সেখানে দাঁড়িয়েই রইল। তার যে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, মাথা নেড়ে তা বুঝাবার চেষ্টাও করল।

চাঁদের মানুষরা আবার চিঁচিঁ করে কি সব বলাবলি করল। তারপর চারজন প্রহরীদের একজন হঠাৎ কেভরের মাথায় ডাঙ্গশ মারল। কেভর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

আমার আর সহ্য হল না। আমি রাগের চোটে সেই প্রহরীর দিকে ছুটে চললাম। আমার রকম দেখে সে ভয়ে ছুট দিল। কেভরের চিৎকার এবং প্রহরীটির পলায়ন, দুইটিতেই তারা অবাক্ হল। তারা আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগল। আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগলাম।

"ব্যাটা আমায় ডাঙ্গশ মেরেছিল!"—কেভর বলল।

"তাই তো দেখলাম!"—আমি উত্তর দিলাম। তারপর চাঁদের মানুষদের উদ্দেশ করে বললাম, "চুলোয় যাক ব্যাটারা। এদের এ অত্যাচার কিছুতেই সইব না। ব্যাটারা আমাদের ভেবেছে কি?"

বলতে বলতে আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বিস্তীর্ণ গুহা জুড়ে অসংখ্য চাঁদের মানুষ। নীল আলোয় তাদের অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তারা সব আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কেউ মোটা, কেউ সরু, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা। এদের মধ্যে শুধু একজনের মাথাই আর

সবার চেয়ে বড়। গহ্বরটি কোন জায়গায় উঁচু, কোন জায়গায় নীচু, কোথাও ঢালু। এখান থেকে পালাবার কোন পথ দেখছি না। উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে সব দিকেই এই অজ্ঞাত মানুষের দল। তাদের হাতে ডাঙ্গশ, মুখে ভ্রূকুটি—সবাই আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। এই শত্রুপুরীতে আমরা দুটি মাত্র নিরস্ত্র মানুষ !

ভের

সেই বিস্তীর্ণ গহ্বরে দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আর আমাদের রক্ষা নেই। তারা চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে একেবারে শেষ করে দেবে।

কেভর আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। বলল, "বড় মুশকিলে পড়েছি। আমাদের কোন কথাই এরা বুঝতে পারছে না। কাজেই ওরা আমাদের যেখানে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।"

তাই সে আর আপত্তি না করে চাঁদের মানুষদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। আমিও তার পিছু নিলাম। রাগে তখন আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। হাতে শিকলটা লাগছে।

তারা প্রথমে একটু দূরে দূরে হাঁটছিল। তারপর আমাদের দু পাশে এল। বেঁটে মোটা লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা একটা নালার কাছে এলাম। এই নালা দিয়ে চলছে সেই নীলাভ আলোর স্রোত। আমি তারই পাশ দিয়ে চলছি। সেই আলো কি উজ্জ্বল। অথচ তার একটুও তাপ নেই। তাপহীন তরল আলো—চাঁদের মানুষের এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা চওড়া সুড়ঙ্গে এসে পৌঁছলাম। তার দেওয়ালে মাঝে মাঝে মানিকের মত উজ্জ্বল দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে। জায়গায় জায়গায় সুড়ঙ্গ আরও চওড়া হয়ে গিয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এর ডালাপালা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

আমরা সুড়ঙ্গ ধরে নীচে নামতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরেই নামলাম। পাশে পাশে সেই নালাও চলছে। তাতে কুলকুল করে সেই আলোর স্রোতও বয়ে যাচ্ছে। আমি তখন ভাবছি, আমার হাতের বাঁধন যদি একটু আলগা করবার চেষ্টা করি, তবে কি ওরা টের পাবে ?

কেভরের কথায় আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। সে বলছে, "বেড-ফোর্ড, আমরা যে কেবলই নীচে নামছি। এরা হয়তো চন্দ্রলোকের নীচের তলার অধিবাসী। আমাদের কোন জানোয়ার বলে ভাবছে। হয়তো চন্দ্রলোকে অন্য ধরনের জীবও আছে, যারা এদের চাইতে উঁচু শ্রেণীর। আমরা যেখান দিয়ে হাঁটছি, এটা হয়তো চন্দ্রলোকের একবারে প্রান্তসীমা। আমাদের অনেক নীচে নামতে হবে ; গুহা, সুড়ঙ্গ ভেদ করে তবে হয়তো চন্দ্রগর্ভে পৌঁছতে পারব। হয়তো শেষ পর্যন্ত শত শত মাইল নীচে সমুদ্রের দেখা মিলবে।

তার কথায় আমার মনে পড়ল, আমরা ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গপথে মাইল খানেক নীচে নেমে এসেছি ; মাথার উপরে পাহাড়ের ছাদ যেন ঘাড়ের উপর চেপে বসছে। আমি বললাম, "পৃথিবীতে আধ মাইল গভীর খনিতে নামলেই হাঁপ ধরে। অথচ এখানে এত নীচুতেও দম নিতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আশ্চর্য !"

"বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে এরা খুব ওস্তাদ। মনে নেই, গুহায় ঢুকবার মুখে কি জোর হাওয়া বইছিল। বাস্তবিক চন্দ্রলোক কি অদ্ভুত ! কত বড় বড় যন্ত্রপাতি তারা বানিয়েছে !"

"ডাঙ্গশ মারতেও এরা ওস্তাদ, এটাও মনে রেখো।"—আমি বললাম।

সে সময় আমার খুব রাগ হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন ভাবছি, তারও দরকার ছিল। তাদের গায়ের চামড়া এবং স্নায়ু দুইই আলাদা ধরনের।

আমরা যে কি বিশাল আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, কেভর সেই কথাই বলতে লাগল। তার চোখের সামনে সেই বিশাল যন্ত্রশক্তি, মনের মধ্যে নূতন নূতন আবিষ্কারের নেশা। আমাদের চারদিকেই যে বিপদের সম্ভাবনা, সে কথাও যেন সে ভুলে গেল।

সে বলল, "যাই বল, এ একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর মানুষ আর চাঁদের প্রাণী পাশাপাশি চলছি। এক গ্রহের সাথে আর এক গ্রহের মিলন! আমরা কত কি দেখব। আরও গভীরে আরও কত নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব। লক্ষ্য করেছ, এখানে সবই কিরকম বিভিন্ন। পৃথিবীতে যখন ফিরে যাব, তখন সবাই আমাদের মুখে এসব খবর পেয়ে একেবারে অবাক্ হয়ে যাবে।"

পৃথিবীতে বসে যা কল্পনাও করা যায়নি, এখানে সে এমন কিছুই দেখবে বলে আশা করতে লাগল। এ সম্বন্ধে কত কথাই বলল। দুঃখের বিষয় আমি তখন তা মন দিয়ে শুনিনি, তাই আর এখন মনে নেই। আমার মন তখন অন্য দিকে ছিল। আমি দেখছিলাম, আমরা যে সুড়ঙ্গপথে চলছি, তা কেবলই চওড়া হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে বাতাস বইছে তাতে আশা করতে লাগলাম, উন্মুক্ত প্রান্তর আর হয়তো দূরে নেই। আমাদের সাথে সাথে যে শীর্ণ আলোকস্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তা অনেক দূরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা ক্রমেই নীচে যাচ্ছি। আমাদের পথ যখন শেষ হল, তখন আমরা একটা পাহাড়ের কিনারে এসে পৌঁছেছি। সেই শীর্ণ আলোকরেখা সেখানে এক আলোর সমুদ্রে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জোরে বাতাস বইছে।

পাহাড়ের কিনারেই পথের শেষ। সেখানে সরু পলকা একটা তক্তা পাতা। সেটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, বুঝবার উপায় নেই। নীচ থেকে গরম হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগছে। সেই পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে নীচের সেই নীলাভ আলোক-

তরঙ্গের দিকে চেয়ে রইলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক প্রথমে আমাদের হাত ধরে টানতে লাগল। তারপর সেই তক্তার উপর দিয়ে খানিক দূর গিয়ে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর আবার ঘুরে আমাদের দিকে পিছন ফিরে সামনে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমাদের পিছনে যে চাঁদের মানুষ কয়টি ছিল, তারাও আমাদের পিছু পিছু তক্তার উপর দিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে রইল।

"এই তক্তার ওপারে ওদিকে কি আছে?" আমি কেভরকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"যাই বলো, আমি কিছুতেই এই তক্তা দিয়ে হাঁটতে পারব না।"

"আমার হাতের বাঁধন খুলে দিলেও আমি এর উপর দিয়ে দু পাও হাঁটতে পারব না। আমার মাথা ঘুরছে। আমার পক্ষে আর এগোনো অসম্ভব। আমি ওদের রকমসকম লক্ষ্য করছি। আমার মনে হয় না, এরা আমাদের মত দেখতে পারে। আমরা যে চোখের সামনে অন্ধকার দেখছি, এ হয়তো এরা বুঝতেই পারছে না। কি করে যে এদের তা বোঝাব, তাও তো বুঝতে পারছি না।"

সত্যি এদের কোন কিছু বোঝান অসম্ভব। তবে আমি যে এই পলকা তক্তার উপর দিয়ে এক পাও যাচ্ছি না, এটা ঠিক। এতে যা হয় হবে। আমাদের হাতের বাঁধনটি একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, আমি এই সুযোগে আমার হাত দুটি একটু আলগা করে নিলাম।

আমি তখনও পাহাড়ের কিনারে সেই তক্তার কাছে দাঁড়িয়ে। দুজন চাঁদের মানুষ আমাকে এসে ধরে তক্তার উপর দিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করতে লাগল।

আমি মাথা নেড়ে আমার অসম্মতি জানাতে লাগলাম। তার

পরে বললাম, "তোমরা তো আমাদের কথা বুঝবে না। তবুও বলছি, আমরা এর উপর দিয়ে কিছুতেই যাব না।"

আরও একজন চাঁদের মানুষ এসে আমায় টানতে লাগল। আমি এক পা এগুতে বাধ্য হলাম। আমি চিৎকার করে তাকে বললাম, "এর উপর দিয়ে যাওয়া হয়তো তোমাদের কাছে কিছুই নয়, কিন্তু—"

আমার কথা শেষ করার আগেই একজন প্রহরী আমার পিঠে তার ডাঙ্গশ মারল।

আমি তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম. "সাবধান! ফের যদি আমার গায়ে হাত দাও"—

আবার সে আমায় মারল। রাগে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। ফলাফল কি হবে না ভেবে আমি সেই প্রহরীর মুখে এক ঘুষি মারলাম। অবাক্ কাণ্ড! আমার হাতটা যেন তার শরীরটাকে গুঁড়া করে দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। আর সে এক তাল কাদার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। চাঁদের মানুষের শরীর যে এমন নরম আর পলকা হতে পারে, তা এর আগে ভাবতেও পারিনি।

আমার এই কাণ্ড দেখে অন্যান্য চাঁদের মানুষেরা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন আমার পায়ের বাঁধনও খুলে ফেললাম। তখনও আমার হাতে শিকল রয়েছে।

কেভর তখনও সেই আলোর শিখায় দাঁড়িয়ে তার হাতের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করছে। আমি তাকে আমার কাছে আসবার জন্য ডাকলাম। সে আমার কাছে এসে তার হাত দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তক্ষুনি তার হাতের বাঁধন খুলতে লাগলাম।

সে তখন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, "এরা সব কোথায় গেল?"

"সে ভাবনা পরে ভাবা যাবে। এখন চলো, পালাই। দেখছ না তারা আমাদের দিকে কি সব ছুড়ছে। হয়তো শীগগিরই আবার ফিরে আসবে। তার আগেই আমাদের পালানো দরকার। কিন্তু কোন্ দিকে যাই বল তো?"

"এই আলোর রেখা ধরে সুড়ঙ্গপথে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।"

ইত্যবসরে তার হাত দুটি মুক্ত হয়েছে। তখন তার পায়ের বাঁধনও খুলে ফেলে শিকলটি তার হাতে দিয়ে বললাম, "দরকার হলে এ দিয়ে ওদের মারবে।" এই বলে আমরা দৌড়োতে লাগলাম। আমি আগে আগে, কেভর আমার পিছনে।

আমরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছি। আমি দেখলাম, আমার সুমুখ দিয়ে একজন চাঁদের মানুষও দৌড়োচ্ছে। সে একটা চিৎকার করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরও কিছু দূর দৌড়ে যাবার পর দেওয়াল দেখা দিল এবং আমরা সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এবার আমি থামলাম এবং পিছন ফিরে কেভরের দিকে তাকালাম। সেও আসছে। তারপর সেও কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাদের মনে হল, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বিপদ কেটে গেল।

এতক্ষণ ধরে এভাবে দৌড়োবার ফলে আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছিলাম। তাই দুজনেই বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম।

কেভর আমাকে অনুযোগ করে বলল, "তুমিই সব মাটি করলে। কি দরকার ছিল, চাঁদের মানুষটাকে এভাবে মেরে ফেলবার?"

"বাজে কথা বলো না। মারব না তো কি, আমরা নিজেরা মরব?"

"এখন কি করবে?"

"এই পাশের কোন একটা সুড়ঙ্গে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকব।"

আমরা খুঁজে খুঁজে একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করলাম। কেভর বলল, "এ যে বড্ড বেশী অন্ধকার।"

"তোমার পা থেকে যে আলো বেরুচ্ছে, তাতেই সব দেখা যাবে। তোমার পা বোধ হয় আলোকধারায় ভিজে গেছে, তাই এই আলো।"

আমরা লুকিয়ে থেকে শুনতে পেলাম, প্রধান সুড়ঙ্গপথে অনেকগুলি মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, চাঁদের মানুষগুলি আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই পদশব্দ মিলিয়ে গেল।

তখন "কেভর ফিসফিস করে বলল, বেডফোর্ড, আমাদের সামনে যেন আলো দেখতে পাচ্ছি।"

আমি চেয়ে দেখলাম। কিন্তু প্রথমে আমার চোখে কিছুই পড়ল না। শেষে অস্পষ্ট আলোকে কেভরের কাঁধ ও মাথা একটু একটু করে আমার চোখে ফুটে উঠল। এই ক্ষীণ আলো নীলাভ নয়, সাদা। অনেকটা দিনের আলোর মত।

কেভর বলল, "বেড্ফোর্ড, এই আলো কি দিনের আলো?" এই বলে সে সেই আলোর দিকে ছুটতে লাগল। আমিও আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে তার পিছু নিলাম।

চোদ্দ

আমরা যতই এগুতে লাগলাম, আলোর উজ্জ্বলতা ততই বাড়তে লাগল। সুড়ঙ্গটিও প্রশস্ত হতে হতে একটি প্রকাণ্ড গুহার সাথে এসে মিশে গেল। এই গুহারই দূর প্রান্তে রুপার মত উজ্জ্বল আলো উপর থেকে নীচে আসছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসে দেখলাম, গুহার দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সে আলো আসছে। আমি সেই ফাঁক দিয়ে উপরের দিকে চাইতেই এক ফোঁটা জল আমার মুখের উপর পড়ল।

আমি কেভরকে বললাম, আমাদের মধ্যে একজন যদি আর

একজনকে তুলে ধরি, তাহলে অনায়াসেই এই ফাঁক দিয়ে উপরে ওঠা যায়।”

“আমি তোমাকে তুলে ধরছি।” এই বলে কেভর আমাকে একটি ছোট শিশুর মত উপরের দিকে তুলে ধরল।

আমি ফাঁকের মধ্য দিয়ে উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই একটা খাঁজ পেলাম। তাই ধরে আমি উপরে উঠে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে কেভরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, “কেভর, আমার হাত ধরে তুমি এবার উপরে উঠে এসো।”

কেভর আমার হাত ধরতেই আমি তাকে টেনে উপরে তুললাম। তারপর আমরা দুজনে সেই দেওয়াল বেয়ে বেয়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। ফাঁকটা ক্রমেই চওড়া হতে লাগল, আর তার মধ্য দিয়ে আসা আলোটাও উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

কিন্তু শীঘ্রই আমাদের আশা ভঙ্গ হল। দেখলাম, সামনে একটা খোলা জায়গা, তাতে অজস্র ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে আছে, আর সেগুলিই রুপার মত উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। আমি এই ব্যাঙের ছাতা কতকগুলি তুলে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে মারলাম। তারপর সেখানেই বসে পড়ে কেভরের দিকে চেয়ে বললাম, “তাড়াহুড়া করবার কিছু নেই। এখানে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নাও।”

“ভেবেছিলাম, এ বুঝি সূর্যের আলো।”—কেভর বলল।

“সূর্যালোক! উষার আলো, অস্তসূর্যের রক্তরাগ, নীল আকাশ, কালো মেঘ, মুক্ত বায়ু—এগুলি কি আর জীবনে দেখতে পাব? এখানে এই পশুর রাজ্যে, এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের সমুদ্রে,—পচে মরাই আমাদের বিধিলিপি। কারণ এখানকার সবাই আমাদের শত্রু। এখন আমরা কি করব, কোথায় যাব—তাই ভাবো।”

“এর জন্য তুমিই দায়ী।”—কেভর বলল।

"আমি দায়ী ? তোমার মুখে আবারও একথা শুনতে হল ! হায় ভগবান্ ।"

"আমার অন্য রকম মতলব ছিল ।"

"চুলোয় যাক তোমার মতলব ।"

"আমরা যদি তখন এমন একগুঁয়েমি না করতাম, তাহলে তারা আমাদের তক্তা-পুলের ওধারে নিয়ে যেত। তার মানে চাঁদের পিঠ থেকে আমরা তার অভ্যন্তর প্রদেশে যাবার সুযোগ পেতাম ।"

হঠাৎ আমার হাতে যে শিকল ঝুলছিল, তার দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম, তা সোনার। কেভরকে আমি সে কথা বললাম।

কেভর তখন অন্য কথা ভাবছিল। আমার কথা প্রথমে তার কানেই ঢুকল না। দ্বিতীয়বার বলাতে সে তার নিজের হাতের দিকে নজর দিল। কারণ তার এক হাতে তখন পর্যন্ত শিকলটি জড়ান ছিল। সে বলল, "তাই তো ! সোনার শিকলই বটে ।"

এমন একটা ব্যাপার এতক্ষণ কেন নজরে পড়েনি, আমি তাই ভাবতে লাগলাম। যারা সোনার শিকল দিয়ে আমাদের হাত-পা বাঁধতে পারে, তাদের রাজ্যে তবে সোনার অভাব নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা তাল তাল সোনা নিতে পারি !

কেভরের কথায় আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। সে বলল, "আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে ।"

"কি রকম ?"

"হয় আমাদের নিজেদের চেষ্টায় আবার চাঁদের পিঠে যেতে হবে, এবং সেখানে গিয়ে আমাদের গোলকটিকে খুঁজে বার করতে হবে, নইলে"—

বলতে বলতে সে থেমে গেল। আমি বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চায়। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, "থামলে কেন, বল ?"

"নইলে চাঁদের মানুষদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।"

"যদি আমার মত নাও, তবে প্রথম পথই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয়টি কোন কাজের কথাই নয়।"

"আমরা চাঁদের মানুষদের কতটুকুই বা দেখেছি? তা দিয়ে তাদের বিচার করা চলে না। তাদের মধ্যে যারা উঁচু স্তরের, তারা নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকের গভীরে বাস করে। যাদের আমরা এ যাবৎ দেখেছি, তারা হয়ত রাখালি করে, ইঞ্জিন চালায়। এদের সাথে যদি অন্ততঃ সপ্তাহ খানেক যুঝে থাকতে পারি, তাহলে আমার মনে হয়, আমাদের সংবাদ উঁচু স্তরের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছবে।"

"ধরে নিলাম যে, চন্দ্রলোকের অভ্যন্তরে উঁচু শ্রেণীর অধিবাসী আছে, কিন্তু তাদের যে আমাদের বা আমাদের পৃথিবীর সম্বন্ধে আগ্রহ হবে তাই বা কি করে বুঝলে? আমার তো মনে হয়, আমাদেরও যে একটা পৃথিবী আছে, এ খবরই তারা রাখে না। রাত্রিবেলায় তো তারা বাইরেই বেরোয় না, পাছে শীতে জমে যায়। সূর্য ছাড়া তারা হয়তো আকাশের আর কোন গ্রহ উপগ্রহই দেখেনি। কাজেই তারা কি করে জানবে যে, চন্দ্র সূর্য ছাড়া অন্য জগৎও আছে? আর জানলেই বা তাদের কি? চিরদিন যারা অতল গহ্বরে অন্ধকারে বাস করে, তারা আকাশে কি আছে না আছে, তা নিয়ে মাথাই বা ঘামাবে কেন? যদি ঋতু পরিবর্তন না হত, বা সমুদ্রে জাহাজ চালাতে না হত, তবে পৃথিবীর মানুষও হয়তো আকাশের দিকে ফিরেও চাইত না।"

"তুমি কি বলতে চাইছ?"

"আমরা সত্যই উভয় সংকটে পড়েছি। আমরা নিরস্ত্র। আমরা আমাদের গোলকটির সন্ধান জানি না। আমাদের সাথে খাবার নেই। আমরা চাঁদের মানুষদের নজরে পড়েছি। তারা ভেবেছে আমরা অদ্ভুত শক্তিশালী জীব। তারা আমাদের ভয় পায়। কাজেই

যদি তারা নিরেট বোকা না হয়, তবে আমাদের খুঁজে বার করবে, এবং সম্ভবতঃ আমাদের হত্যাও করবে। এই আমাদের শেষ পরিণতি।"

"বুঝলাম। তারপর ?"

"অন্যদিকে এ রাজ্যে সোনার ছড়াছড়ি। যেই আসুক সেই সোনার তাল পাবে। যদি আমরা আরও কিছু সোনা কুড়িয়ে নিতে পারি, আমাদের গোলকটি খুঁজে পাই. আর ইতিমধ্যে যদি চাঁদের মানুষেরা আমাদের সন্ধান না পায়, তাহলে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আমরা আরও বড় একটা গোলকে কামান বন্দুক নিয়ে আসতে পারি। তখন আর আমাদের এদের ভয় করে চলতে হবে না।"

"তুমি আমায় হাসালে বেড্ফোর্ড।"

"দেখ কেভর, এ ব্যাপারে আমারও একটা নিজস্ব মতামত আছে। আমি বাস্তববাদী মানুষ, তোমার মত কল্পনাবিলাসী নই। যদি নেহাত না ঠেকি, তবে আর চাঁদের মানুষদের কবলে পড়তে চাইনে। চল, আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার চেষ্টাই করি। আর একবার না হয় আসা যাবে।"

কেভর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চাঁদের রাজ্যে আমার একা আসাই উচিত ছিল। তোমাকে সাথে আনা ভুল হয়েছে।"

"সে কথা থাক। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের গোলকটির সন্ধান কি করে পাওয়া যায়।"

"সেটা খুব শক্ত কথা নয়। সূর্য যতক্ষণ চাঁদের এই দিকটায় আছে ততক্ষণ এই দিক থেকেই বাতাস বইবে। এই তো টের পাচ্ছ যে বাতাস এই দিক থেকেই বইছে।"

"তা পাচ্ছি, বটে।"

"তার মানে এটাই চাঁদের শেষ দিক নয়। এই যে ফাটল, এ আরও উপরের দিকে গেছে। এ পথ ধরেই আমাদেরও উপরে উঠতে হবে।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই আমরা প্রথমে কোলাহল এবং পরে বিকট ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম।

কেভর বলল, "তারা এ পথেই আসছে। তবে এই ফাঁক দিয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা হয়তো করবে না, নীচ দিয়েই চলে যাবে।"

আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কেভরকে বললাম, "কিন্তু আমি যে সর্বনাশ করে বসে আছি। ব্যাঙের ছাতাগুলি আমি ভেঙে নীচে ফেলেছি। সেগুলি নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়বে তখনই তারা এদিকে ধাওয়া করবে।"

এই বলেই আমি সেই গুহার উপর দিকে মারলাম এক লাফ। তারপর দুটি ব্যাঙের ছাতা ছিঁড়ে নিয়ে একটা আমার বুক পকেটে রাখলাম, আর একটি কেভরকে দিলাম। আমাদের পকেটে সেগুলি জ্বলজ্বল করতে লাগল। তারপর কেভরের পিছু পিছু সেই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

পনের

উঠতে উঠতে এক জায়গায় এসে বাধা পেলাম। সেখানে একটা রেলিং-এর বেড়া! তার ফাঁক দিয়ে আর একটি স্বল্পালোকিত গুহা নজরে পড়ল। কয়েকজন চাঁদের মানুষ সেখানে খুব ব্যস্ত হয়ে কি যেন করছে। একটা রেলিং বেঁকিয়ে আমি আস্তে আস্তে ওদিকটায় গেলাম। তা দেখে কেভরও এসে আমার সাথে যোগ দিল। আমরা তখন বেড়ার পাশে একটা অন্ধকার জায়গা বেছে সেখান থেকে উঁকি মেরে চাঁদের মানুষদের কার্যকলাপ দেখবার চেষ্টা করলাম।

দেখলাম, সারি সারি চাঁদের বাছুর মরে পড়ে আছে। চাঁদের মানুষেরা তা কেটে টুকরো টুকরো করে গাড়ি বোঝাই করছে। অবাক্ হয়ে দেখলাম, যে কুড়ুল দিয়ে তারা মাংস টুকরো করছিল, তার বাঁটও সোনার। আশেপাশে কয়েকটা লম্বা ডাণ্ডা পড়ে আছে, তাও সোনার। গাড়িটা মাংস বোঝাই হলে, নীচে ঢালুর দিকে গড়িয়ে চলতে লাগল।

তা হলে এটা কসাইখানা আর এরা সব কসাই!

তারপর দিলাম এক লাফ। যেন উড়ে চললাম।

এমন সময় সেই ফাটলের নীচের দিকে একটা কোলাহল শোনা গেল। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে মড়ার মত চুপ করে পড়ে রইলাম। সেই ফাটল বেয়ে কেউ আস্তে আস্তে উপরে উঠছে, এটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম। আমি আমার হাতের শিকলটি শক্ত করে ধরে তৈরী হয়ে রইলাম। দরকার হলে এইটিই আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করব।

পদশব্দ ক্রমেই আরও কাছে এল। একজন নয়, অনেক জনই আসছে। তাদের কথাবার্তাও কানে আসছে। সামনেই একটা বর্শা ছিল, আমি তা তুলে নিয়ে, রেলিংএর ভিতর দিয়ে অন্ধকারে এলোপাথাড়ি খোঁচা দিতে লাগলাম। কসাইয়ের দলে হাহাকার শুরু হল। আমার দেখাদেখি কেভরও আর একটা বর্শা তুলে নিয়ে কসাই নিধন যজ্ঞে আমার সাথে যোগ দিল। এমন সময় একটা কুড়াল ছুটে এসে আমার কাঁধ ঘেঁষে পাহাড়ের গায়ে লাগল।

বোঝা গেল, কসাইয়ের দল চারদিক থেকে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। তাদের সবার হাতেই কুড়াল। আগে যে সব চাঁদের মানুষ দেখেছি, তাদের সাথে এদের মিল নেই। এরা বেঁটে, মোটাসোটা, এদের হাত ছুটি বেশ লম্বা লম্বা। বর্শাটি হাতে নিয়ে আমি ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

"কেভর, তুমি বেড়াটি আগলে থাক। আমি এদের এক হাত নিচ্ছি।" এই বলে এক হুংকার দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য, ওদের ভয় দেখানো। ফল যে হল না, তাও নয়। ছুজন কসাই আমার দিকে তাদের কুড়াল ছুড়ে মারল। ছুটিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বাকী সব এদিকওদিক পালাতে লাগল। আমি তখন বর্শা ফেলে ছুহাতে ছুটি সোনার ডাণ্ডা তুলে তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করলাম।

কেভরও তখন আমার পিছু নিল। একটি রোগা চাঁদের মানুষ এ সময় বন্দুকের মত কি একটা হাতে নিয়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে আমাদের দিকে আসবার চেষ্টা করছে। আমি তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখা গেল তার হাতে বন্দুক নয়, ধনুক। তা থেকে সে

তীর ছুড়ছে। তীরটা আমার গায়ে এসে লাগল। আমি সামান্য ব্যথা বোধ করলাম। তারপরই মারলাম তার মাথায় ডাণ্ডার আঘাত। ডিমের খোলার মত তার মাথা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখনই আবার আমি ছুটলাম, যেখানে কসাই দল আমাদের আক্রমণ করার জন্য জড় হয়েছে। আমি তখন বেপরোয়া। কি করতে যাচ্ছি, সে বোধও যেন নেই।

কেভরের পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় সে বাধা দিল। বলল, "বেড্‌ফোর্ড"—

বাকীটা শুনবার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম না। দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম। কেভরও তখন আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসতে লাগল।

এসে দেখি, বিশাল জনতা। তারা সবাই এদিকওদিক ছুটছে। পিঁপড়ের বাসায় ঢিল ছুড়লে পিঁপড়েরা যেমন করে, তারাও তাই করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই হয় বর্শা, নয়তো কুড়াল। আমার মাথার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে দু'তিনটা বর্শা উড়ে গেল। তার পর শুরু হল চারদিক থেকে বর্শা-বৃষ্টি।

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। কি যে করব তাও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বেগতিক দেখে শেষে দুটো বৃহদাকার ময়া চাঁদের বাছুরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করলাম।

কেভরও হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমিও তখন হাঁপাচ্ছি। হাঁপাতে হাঁপাতেই কেভর আমায় ডাকল।

আমি তার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললাম, "কি বলছ?"

সে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই দেখ আবার দিনের আলোর মত আলো দেখা যাচ্ছে।"

উপরের দিকে চেয়ে দেখি, কেভর ঠিকই বলেছে। তাই দেখে আমার দেহে মনে যেন আবার হারানো শক্তি ফিরে এল। আমি তখন ফন্দি করে একটি ডাণ্ডার গায় আমার কোটটি চড়িয়ে সেটা একটা

বাছুরের উপর দাঁড় করিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বিঁধতে লাগল।

আমি আর এক দিক দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের আক্রমণ করলাম। হাতের ডাণ্ডা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে পিটাতে লাগলাম। শত শত চাঁদের মানুষ মাটিতে গড়াতে লাগল। অবশ্য তাদের বর্শাও এসে আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। যাকে সামনে পাচ্ছি, তাকেই মারছি। অর্ধেকেরও বেশী যখন আমার হাতে মারা পড়ল, বাকী অর্ধেক তখন পালাল। চারদিকে তখন কেবল মরা চাঁদের মানুষ।

এতক্ষণে আমি আমার দিকে নজর দিবার ফুরসত পেলাম। আমার এক কানের কাছে বর্শার খোঁচা লেগেছে। হাত এবং গাল কেটে রক্ত পড়ছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি তখন কেভরের কাছে ছুটে গেলাম।

রোদ্দুর

আমরা সামনে যে পথটি পেয়ে চলতে শুরু করলাম, তা প্রথমে খানিকটা নীচের দিকে নেমে আবার উপরে উঠে একটা গোলাকৃতি গহ্বরের কিনারে এসে মিশেছে, তারপর আবার উপরের দিকে গিয়ে একবারে পাহাড়ের গায় ঠেকেছে। আমাদের মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশে সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে।

আবার উন্মুক্ত আকাশ, আবার দিনের আলো। এ যেন আশার অতীত সাত রাজার ধন! অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ!

আমি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললাম। কেভরকে ডেকে বললাম, আমার পিছু পিছু আসতে। কেভর তখন নীচের সেই অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকিয়েছিল। বলল, "এই বোধহয় সেই গহ্বর, যার উপরের ঢাকনা সরে যেতে আমরা এর আগে দেখেছিলাম।"

"এরই ভেতরে বোধ হয় আমরা প্রথম নীলাভ আলো দেখেছিলাম।"

"হাঁ, সেই আলো হয়তো আর আমাদের দেখা হবে না।"

"কেন হবে না ? আমরা আবার চাঁদে ফিরে আসব।"

কেভর কি উত্তর দিল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমরা যে সিঁড়ি-পথ বেয়ে উপরে উঠছিলাম, তা অন্ততঃ চার পাঁচ মাইল লম্বা। পৃথিবীতে এতটা লম্বা পথ বেয়ে উপরে ওঠা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু চন্দ্রলোকে এটা খুবই সহজ, তাই আমরা এতটা পথ ভেঙে অনায়াসেই চাঁদের পৃষ্ঠদেশে এসে পৌঁছলাম।

দেখি সব উদ্ভিদ্‌গুলিই মরে শুকিয়ে গেছে। মাথার উপরে প্রখর সূর্য, পায়ের নীচে উত্তপ্ত পাথর। যে আলো ও উত্তাপের জন্য এতক্ষণ আকুলিবিকুলি করছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা অসহ্য মনে হতে লাগল। বাতাসও এখানে এত পাতলা যে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল। না পেরে শেষে আমরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে হাঁপাতে শুরু করলাম। ঝোপের ছায়ায়ও পায়ের নীচের পাথর আগুন ছড়াতে লাগল। দুজনেই তখন খুবই ক্লান্ত, তবে দুজনের মন থেকেই তখন ভয়ের ভাব অনেকটা কেটে গেছে।

আমি কেভরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তারা এখন কি করবে ? আমরাই বা কি করব ?"

তার চোখ তখন সুড়ঙ্গের দিকে। মাথা নেড়ে উত্তর দিল, "তারা কি করবে, তা কেমন করে বলব ?"

"আমরা যদি এই শুকনা ঝোপঝাড়ে আগুন জ্বেলে দি, তাহলে ছাইয়ের মধ্যে হয়তো আমাদের গোলকটার সন্ধান পাব।"

"কিন্তু তাতে লাভ কি হবে ?" এই বলে সে আকাশের তারার দিকে চেয়ে রইল। এই প্রখর সূর্যালোকেও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছিল। চন্দ্রলোকে দেখছি সবই অদ্ভুত !

খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করল, "ক'দিন হল আমরা চন্দ্রলোকে এসেছি, বলতে পার ?"

"পৃথিবীর হিসাবে ছ দিন হবে হয়তো।"

"বল কি? অন্ততঃ দিন দশেক হবে। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে হেলছে, আর চার দিনের মধ্যেই রাত শুরু হবে। একটানা চোদ্দ দিন রাত চলবে।"

"এই দশ দিনে আমরা মাত্র একবার খেয়েছি? চাঁদে আছি বলে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও কম, কেন বল তো?"

"বলতে পারব না। তবে দেখছি, এখানকার ধরনধারণই আলাদা। ক্ষুধা বল, পরিশ্রম বল, এখানে সবই কম।"

"দশ দিন কেটে গেছে। রাত শুরু হবার আর মাত্র চার দিন বাকী। কেভর! এ অবস্থায় আমাদের এভাবে সময় কাটানোর কোন মানে হয় না। এস, গোলকটি খুঁজতে শুরু করি। একটা গাছে একটা রুমাল বেঁধে এখানে একটা নিশানা রেখে, দুজন দু-দিকে যাব। একজনের চোখে গোলকটা পড়বেই।"

"যদি না পড়ে?"

"যতক্ষণ না খুঁজে পাই, ততক্ষণ আমাদের খোঁজা চলবে।"

কেভর চুপ করে কি ভাবল। তারপর আপন মনেই বলতে লাগল, "কি বোকামিই না আমরা করছি! এখানে এক নূতন জগৎ, নূতন তার অধিবাসী। আমাদের পায়ের নীচে চাঁদের ভিতরে গুহার পর গুহা, সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, পথের পর পথ। যত নীচে যাওয়া যাবে, ততই হয়তো তা চওড়া হবে, ততই বেশী লোকজনের দেখা পাওয়া যাবে। একেবারে অভ্যন্তরে যেখানে নীল আলোর স্রোত গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে হয়তো জাহাজ চলে, তারও নীচে হয়তো বড় বড় শহর আছে, হয়তো সেখানে জ্ঞানী-গুণী লোক বাস করে। আমরা মরলেও আর তাদের দেখা পাব না, এই আপসোস রয়ে গেল।"

"আমরা তো আবারও এখানে আসতে পারি। তখন আমরা আলো, সিঁড়ি, খাবার—হাজার রকমের দরকারী জিনিস নিয়ে আসব।"

কেভর কোন উত্তর দিল না। সে সেই ফাটলের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "চাঁদের দেশে আসার পথ আমারই আবিষ্কার। কিন্তু পথ আবিষ্কার করা আর তার উপর প্রভুত্ব করা তো এক কথা নয়। পৃথিবীতে ফিরে যদি আমরা এ তথ্য ফাঁস করি,—ফাঁস করতেই হবে। ক'দিন আর চুপ করে থাকতে পারব ? জানাজানি হবেই। তখন সব দেশ, সব রাষ্ট্র এখানে আসবার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করবে। এখানে এসে নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করবে, চাঁদের মানুষদের সাথে গোলমাল শুরু করবে। ফলে এই চন্দ্রলোক মনুষ্য কঙ্কালে ভরে উঠবে।···এসব কথা এখন ভেবেই বা লাভ কি? আমাদের গোলক খুঁজে পাওয়া, তাতে করে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া—সে নেহাতই দুরাশা। আমাদের দুর্যোগ তো সবে শুরু হয়েছে। চাঁদের মানুষদের উপর আমরা হামলা করেছি, তাদের আমরা মেরেছি। এতক্ষণে সে খবর সব জায়গায়ই পৌঁছে গেছে।"

"যাই বল, এখানে এভাবে বসে এ সব ভাবলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না।"

এই বলে আমি উঠলাম। কেভরও উঠে দাঁড়াল।

একটা লাঠিতে একটা রুমাল বেঁধে তা মাটিতে পুঁতে দিলাম। এটাই আমাদের নিশানা। কেভর পুব দিকে, আর আমি পশ্চিম দিকে যাব, তেষ্টা পেলে বরফকুচি মুখে দেব, আর খিদে পেলে চাঁদের বাছুর মেরে খিদে মেটাব, এই স্থির হল। আমাদের মধ্যে যারই চোখে গোলকটি পড়বে, সেই এখানে ফিরে এসে অন্যের জন্য অপেক্ষা করবে।

"কিন্তু যদি কেউই খুঁজে না পাই ?" কেভর আবার সেই একই প্রশ্ন করল।

"যতক্ষণ না রাত শুরু হয়, ঠাণ্ডায় জমে না যাই, ততক্ষণ খুঁজেই

যাব। কিন্তু যদি চাঁদের মানুষরা আমাদের আগে তা বের করে লুকিয়ে ফেলে, তবে অবশ্য খুবই মুশকিল হবে।"

কেভর-কোন উত্তর দিল না।

আমিই আবার বললাম, "আর যদি তারা এখনই আবার আমাদের আক্রমণ করতে আসে?"

তবুও কেভর কোন সাড়া দিল না।

আমার হাতে দুটি ডাণ্ডা ছিল। আমি একটি তাকে দিতে চাইলাম। সে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "বিদায় বন্ধু!"

শুনে আমার মনটা কেমন করে উঠল। আমি হাত বাড়িয়ে তার সাথে করমর্দন করব ভাবছি, এরই মধ্যে সে পুবদিকে মুখ করে লাফ দিল। আমি খানিক হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে আমিও এক লাফ দিলাম।

কেউ আর কাউকে দেখতে পেলাম না। শুধু রুমালটি নিশানা হয়ে সেখানে উড়তে লাগল।

সভেন্ন

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর রোদের তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তা ছাড়া হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও ভারী কষ্ট হচ্ছিল। তাই একটা গর্তের মত জায়গা পেয়ে আমি তার ভিতরে বসে পড়লাম। গর্তটার ধারে ধারে কতকগুলি শুকনা গাছ থাকায় তাদের ছায়া পড়ে ভিতরে একটু ঠাণ্ডা ভাব ছিল।

এখানে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সোনা, শুকনা ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সোনার তাল। কিন্তু এত সোনা থাকতেও আমার কি লাভ? আমি তো আর এগুলি নিয়ে যেতে পারব না। কারণ গোলকটি খুঁজে পাওয়ার আশা আমি এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। ক্লান্তিতে শরীরও ভেঙে আসছিল। আস্তে আস্তে ঘুমে আমার চোখ বুজে এল। বেশ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আমি তখন সোনার ডাণ্ডা দুটি দুহাতে নিয়ে গোলকের খোঁজে বেরুলাম।

সূর্য তখন আরও নেমে গিয়েছে। বাতাস ক্রমেই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি একটা পাহাড়ে উঠে চারদিকে দেখতে লাগলাম। কোথাও কোন জানোয়ার বা চাঁদের মানুষ নজরে পড়ল না। কেভরকেও দেখতে পেলাম না। শুধু আমাদের নিশানা—রুমালটিকে দূরে দেখা গেল।

আমি অর্ধ-বৃত্তাকারে চলতে লাগলাম। কিন্তু বৃথা অন্বেষণ। লাভের মধ্যে আমার শরীর আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল, মনও হতাশায় ভেঙে পড়ল। তার উপর সর্বদাই ভয়, কখন চাঁদের মানুষেরা আগের মত সব ঢেকে ফেলবে, আর আমরা বাইরে রাতের ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যাব।

গোলকের ভাবনা আমার মাথায় উঠল। আমি কেভরের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। এক একবার মনে হচ্ছিল, কেভরকে ফেলেই আবার চাঁদের ভিতরে ঢুকে পড়ি। আমি আমাদের নিশানার ঠিক মাঝামাঝি পথ এসেছি, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, দূরে অনেক দূরে পশ্চিম দিকে আমাদের গোলকটি পড়ে আছে। অস্তগামী সূর্যের রাঙ্গা আলো তার কাচের গায়ে পড়ে ঝিকমিক করছে।

আমি মাথায় হাত তুলে আনন্দে নাচতে শুরু করলাম, চিৎকার করে কেভরকে ডাকতে লাগলাম, এবং জোরে জোরে গোলকটির দিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলাম। এত জোরে দৌড়াচ্ছিলাম যে, তাল সামলাতে না পেরে কাচের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে হাঁপাতে লাগলাম। বুকে দম নেই, তবুও প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম, "কেভর, আমাদের গোলকের সন্ধান পেয়েছি।"

আমি অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে তার ভিতরে গিয়ে বসলাম। কাচের ভিতর দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে এক একবার শিউরে উঠতে লাগলাম। তারপর হাতের সোনার ডাণ্ডা দুটি এক পাশে রেখে কিছু খেলাম।

তখন মনে হল, আর দেরি নয়। এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কেভরের খোঁজ করে তাকে এই সুসংবাদটি দিতে হবে। অনেক কষ্টে গোলক থেকে বের হলাম। বাইরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা। তার উপর আবার ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল।

আমার মনে হল, কেভরকে রক্ষা করতে হলে আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলে চলবে না। আমি তখন গা থেকে আমার ভেস্ট খুলে একটা শুকনা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম, যাতে জায়গাটা আবার না হারিয়ে ফেলি। তারপর সোজা সেই রুমাল লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম।

সেখানে পৌঁছে আমি একটা উঁচু জায়গায় উঠে জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম, "কেভর! কেভর!" কিন্তু সেই হালকা বাতাসে আমার নিজের গলা আমার নিজের কানেই অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল।

চারদিক নিথর, নীরব। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা যেন সব কিছু স্তব্ধ করে রেখেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, অদূরে কয়েকটা ডালে যেন কি জড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি, কেভরের টুপি। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। আরও দশ বারো গজ দূরে দেখি একটা দুমড়ানো কাগজ। তুলে নিতেই দেখি তাতে রক্তের দাগ। খুলে দেখি, পেনসিলে লেখা—

"আমার হাঁটুতে খুব চোট পেয়েছি। আমি হাঁটতেও পারছি না, হামাগুড়িও দিতে পারছি না। অথচ তারা আমায় ধাওয়া করছে, দু চার মিনিটের মধ্যেই হয়তো আমায় ধরে ফেলবে। তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।···এদের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।···এদের মাথা বেশ বড়, শরীর কৃশ, পা গুলি খুবই ছোট।···এরা কথাবার্তা আস্তে বলে, বেশ নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। এদের দেখে আমার মনে এখনও আশা হচ্ছে।··তারা আমায় এখনও গুলি করেনি বা করবার চেষ্টাও করেনি।···আঘাত। আমার ইচ্ছে হচ্ছে"—

এর পর আর কিছু লেখা নেই। শুধু রক্তের দাগ।

আমি কাগজটা হাতে করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কেভরের কথা ভেবে মন বিষাদে ভরে উঠল। এমন সময় হঠাৎ কি যেন আমার হাতে মৃদু কোমল শীতল স্পর্শ রেখে মিলিয়ে গেল। বুঝলাম আসন্ন রাত্রির অগ্রদূত তুষারের স্পর্শ।

আমি চমকে আকাশের দিকে তাকালাম। নিকষ কালো অন্ধকারে মিটমিট করে তারা জ্বলছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, কনকনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে তুষারপাত শুরু হল, চারদিক অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

আর সেই মুহূর্তে আমার কানে এল সেই বুম্‌বুম্ শব্দ। এই শব্দ এর আগেও একদিন শুনেছিলাম।

আজ আর সে দিকেও মন দিতে পারছিলাম না। আমার সমস্ত মন জুড়ে কেবল কেভরের চিন্তা। তার কি হল ? সে কি তবে এদের হাতে ধরা পড়েছে ?

এইসব ভাবছি, এরই মধ্যে সেই শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আর সাথে সাথে সুড়ঙ্গের মুখও কে যেন ঢেকে দিল। আমি সেই বিজনে একলা দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার মাথার উপরে, চারদিকে, কাছে, দূরে—বিরাট শূন্যতা আর স্তব্ধ রাত্রি। প্রতিক্ষণে মনে হল, মৃত্যু তার হিমশীতল ভয়াল রূপ নিয়ে আমাকে গ্রাস করতে আসছে।

না না, আমি এভাবে মৃত্যুর কাছে ধরা দেব না। আমাকে এখনও বাঁচতে হবে। হে মৃত্যু, যাও, দূরে সরে যাও। আমি মনে মনে এই কথা বলতে লাগলাম। মুখে কথা ফুটছে না, শরীর অবশ হয়ে আসছে।

শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে আমি গোলকটির দিকে এগুতে লাগলাম। এখনও মাইল দুই বাকী। এখনও অন্ততঃ একশো বার লাফাতে হবে, অথচ বাতাস ক্রমেই হালকা হয়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডা যেন মরণ কামড় বসাচ্ছে, হাত পা অবশ হয়ে

আসছে। মৃত্যু আসছে, আসুক। মরতে হলে লাফাতে লাফাতেই মরব। কতবার যে তুষারের উপর হোঁচট খেলাম, কতবার পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।

আর পারছি না। গলা দিয়ে কথা ফুটছে না। ফুসফুসে কে যেন ছুরি চালাচ্ছে, এমনি ব্যথা লাগছে। কেবলই চিন্তা—পৌঁছতে পারব তো গোলক পর্যন্ত ? এখনও তো ওটা কত দূরে !

দেহ আর চলে না। সে চায় শুয়ে পড়তে। আমি জোর করে এগুতে লাগলাম। কতবার হোঁচট খেলাম, শরীরের কত জায়গা কেটে গেল, এক বিন্দু রক্ত বেরুল না। শরীর তো শরীর নয়, যেন বরফ। আর পারছি না—আর কত দূরে ? হায় ভগবান্ !

ওই তো ! ওই দেখা যাচ্ছে। আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না, তাই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। আমার চোখে মুখে বরফ জমতে লাগল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। আরও দশ বার গজ যেতে হবে, তবে গোলকটির নাগাল পাব।

দশ বার গজ !—সে যেন দশ বারো মাইল। মন হতাশায় ভেঙে পড়ল। এইটুকু পথও বুঝি আর চলতে পারব না। এর আগেই বুঝি একবারে অবশ হয়ে পড়ব, ঢলে পড়ব মৃত্যুর কোলে।

না, তা কিছুতেই হবে না। যেতেই হবে এইটুকু ! এই তো এসেছি, এই তো গোলকটি স্পর্শ করেছি। আঃ ! ওই তো ফুটোটা দেখা যাচ্ছে। পারছি না, ওখানে যেতে পারছি না। কিন্তু যেতেই হবে। মনের সমস্ত জোর একত্র করে শেষ চেষ্টা করলাম। কোন রকমে টলতে টলতে মাথা গলিয়ে গোলকের ভিতরে প্রবেশ করলাম। ফুটো দিয়ে তুষারকণা আসছে। ফুটোটি বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সেই শক্তি কোথায় ? মন বলল, এত নিরাশ হলে চলবে না। চেষ্টা কর। চেষ্টা কর। অনেক কষ্টে ফুটোর ঢাকনাটি বন্ধ করলাম। তারপর মরার মত অবশ হয়ে পড়ে রইলাম। মনে হল, শরীরে আর এক বিন্দু শক্তিও নেই।

ভেতরের গরমে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আড়ষ্টতা খানিকটা দূর হল। হাত তখনও কাঁপছে—সেই হাত দিয়েই পাগলের মত যন্ত্রপাতি আর খড়খড়ির সুইচগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

এক সময় খুট্ করে একটা শব্দ হল। আর অমনি চন্দ্রলোক আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমি মহাশূন্যে ভেসে চললাম।

আহার

মহাশূন্যে আমি একা। সঙ্গে কেউর নেই। আমার বিষম ভয় করতে লাগল। আমি উপরে—কেবলই উপরে উঠছি। অন্ধকারে আর কিছু বুঝতে পারছি না। আমার হাত আর তখন সুইচে নেই। আমি গোলকের ভিতর শূন্যে ভাসছি। এদিকে গোলকের ভিতরের সমস্ত জিনিস, সোনার শিকল, সোনার ডাণ্ডা দুটি—সবই ঠিক মাঝখানে এসে জড় হয়েছে।

এক সময়ে আমিও এসে সেখানে বসলাম। এতক্ষণ আমি যেন স্বপ্নলোকে ছিলাম। এবারে যেন জেগে উঠলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, যদি আমাকে জেগে থাকতে হয়, তবে হয় আলো জ্বালাতে হবে, নয়ত খড়খড়ি দু একটা খুলে দিতে হবে, যাতে অন্ততঃ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকতে পারি। তাছাড়া তখনও শরীরের শীতভাব কাটেনি। আমি তখন হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বাললাম। দেখলাম সেই পুরানো খবরের কাগজটি শূন্যে ভাসছে। এটি দেখে আমি যেন আবার বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। আমি তখন স্টোভ জ্বাললাম, যাতে খানিকটা গরম হতে পারি। তারপর কিছু খেলাম। এবার একটু চাঙ্গা বোধ করলাম। তখন খড়খড়িগুলি এক একটি খুলে খুলে বুঝতে চেষ্টা করলাম গোলকটি কোন্ দিকে যাচ্ছে।

প্রথম খড়খড়িটি খোলার সাথে সাথেই বন্ধ করতে হল। কারণ উজ্জ্বল সূর্যের প্রখর কিরণে আমার চোখ যেন ঝলসে গেল। এর পর আর

এক দিকের একটা খড়খড়ি খুলতেই অর্ধচন্দ্র এবং তার পিছনে আমাদের পৃথিবী দেখা গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম চাঁদ থেকে কত দূরে চলে এসেছি।

কেভরের কথা মনে হল। নিশ্চয়ই সে আর বেঁচে নেই। আমি যেন মানস চক্ষে দেখতে পেলাম, সে হাঁটু ভেঙ্গে কোন্ জলার ধারে পড়ে আছে। আর চাঁদের মানুষরা চারদিকে জড়ো হয়ে তাকে দেখছে। কত আশা নিয়ে সে চাঁদে এসেছিল। তার আত্মার শান্তি হোক্—মনে মনে এই প্রার্থনা করলাম।

শূন্যে উড়তে উড়তে খবরের কাগজটা আমার গায়ে এসে লাগল। আমি যেন তখন আবার বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, পৃথিবী থেকে দূরে, বহু দূরে ভেসে চলছি। তাই চিন্তা হল, কেমন করে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব। সেই চিন্তার যেন শেষ নেই, অথচ চিন্তা করেও কোন পথ পাচ্ছিলাম না। কারণ গোলকের সব যন্ত্রপাতি আমার জানা ছিল না। চন্দ্রলোকে যাত্রার সময় কেভরই গোলকটিকে চালিয়ে নিয়েছিল, আমি শুধু বসে বসে দেখছিলাম। নিজ হাতে কিছুই করবার দরকার হয়নি। কেন তখন ভাল করে সব কলাকৌশল শিথিনি, এই ভেবে আপসোস হতে লাগল।

যাহোক্ প্রথমে আমি চাঁদের দিকের খড়খড়িগুলি খুলে দিলাম। চাঁদের আকর্ষণে গোলকটি চাঁদের দিকে ছুটতে লাগল। যখন চাঁদের খুব কাছাকাছি এলাম, তখন সব খড়খড়িগুলি বন্ধ করে দিলাম। গোলকটি আবার চাঁদকে ফেলে উপরে উঠতে শুরু করতেই, পৃথিবীর দিকের খড়খড়ি খুলে দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম।

গোলকের ভিতরটা মোটামুটি গরম। শীত আর নেই। শুধু মাথাটা কেমন একটু ঝিমঝিম করছে। তা ছাড়া মোটামুটি ভালই আছি। আলোটি নিবিয়ে দিলাম। অযথা আলো খরচ করবার মত অবস্থা তখন নয়। কারণ প্রয়োজনের সময় আলো ফুরিয়ে গেলে

মুশকিলে পড়ব। কাজেই গোলকের ভিতরটি আবার আঁধার হয়ে গেল। শুধু পৃথিবীর আবছা আলো আর তারার ক্ষীণ আভায় সে আঁধার একটু আধটু পাতলা হল। চারিদিক এত নীরব, স্তব্ধ, শব্দহীন যে, মনে হল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে এই মহাশূন্যে আমিই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বভাবতঃই ভয় হবার কথা। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে ভয়ের কোন ভাবই ছিল না। আমি যেন তখন ভয় ভাবনার ঊর্ধ্বে চলে গেছি, এম্‌নি মনের অবস্থা।

কতক্ষণ বা কতদিন যে আমি মহাশূন্যে ছিলাম জানি না। এক এক বার মনে হত যেন এক যুগ, আবার মনে হত যেন মাত্র কয়েক মূহূর্ত মাত্র। আসলে আমি কয়েক সপ্তাহ গোলকে ছিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবীর আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম। তখন ভয় হল, গোলকের গতি যদি নিয়ন্ত্রিত না করতে পারি, যদি ওটা গিয়ে কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খায়, তবে একবারে চুরমার হয়ে যাব! ঘাটে এসে না ভরাডুবি হয়!

উনিশ

গোলকটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে এসে পৌঁছল। ফলে ভিতরের তাপ হঠাৎ অনেক বেড়ে গেল। বেশ গরম বোধ করতে লাগলাম। নীচে অনন্ত-বিস্তার সমুদ্র নজরে পড়ল। আমি সমস্ত খড়খড়িগুলি খুলে দিলাম। ক্রমে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এল, সন্ধ্যা হল, তারপর রাত এল। বাইরে পৃথিবীর আকার বড় হতে লাগল। শেষে পৃথিবী আর গোলাকার রইল না—সমতল দেখাতে লাগল। পৃথিবী তখন আর মহাশূন্যের গ্রহমাত্র নয়, মানুষের জগৎরূপে দেখা দিল। আমি আবার একটি মাত্র খড়খড়ি খোলা রেখে বাকীগুলি বন্ধ করে দিলাম। গোলকটি ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। শেষে ওটা সমুদ্রের এত কাছে এসে গেল যে

আমি ঢেউয়ের দোলা, তার ফেনা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। ভিতরটা তখন এত গরম হয়ে উঠেছে যে, আমি আর তা সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি তখন শেষ খড়খড়িটিও বন্ধ করে চুপটি করে বসে রইলাম, কখন গোলকটি গিয়ে ধরণীকে স্পর্শ করে!

তারপর এক সময় ওটা সমুদ্রের উপর আছড়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটি খড়খড়ি খুলে দিলাম। দেখলাম, গোলকটি সমুদ্রে ভাসছে। এতদিনে আমার মহাশূন্যে অভিযানের পরিসমাপ্তি হল। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলাম।

তখন রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে আলো দেখে মনে হয় একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে। কিন্তু গোলকের বাতিটি নিঃশেষ হওয়ায় আমি যে আলো জ্বালিয়ে জাহাজটিকে ইশারা করব, তারও উপায় ছিল না। কাজেই রাতটি গোলকে কাটান ছাড়া গত্যন্তর নেই। এদিকে আমার সমস্ত শরীর যেন ভারী আর ক্লান্ত লাগছিল। তাই একসময়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতে দেখলাম, আমি সমুদ্রের বালুবেলায় আছি। অদূরে ঘরবাড়ি গাছপালা দেখা যাচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই মাথা ঘুরতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল।

এই অবস্থায়ই আমি বেরুবার জন্য ফুটোটি খুললাম। হু হু করে বাতাস এসে গোলকে ঢুকতে লাগল। সেই বাতাসের ধাক্কা এসে আমার বুকে লাগতেই আমি পড়ে গেলাম। খানিকক্ষণ বুকে কি রকম ব্যথা বোধ করতে লাগলাম। ঘন ঘন শ্বাস বইতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং ধীরে ধীরে গোলক থেকে বেরিয়ে এসে বালুবেলায় পা দিলাম।

তখন ভোর হয়ে গেছে। অদূরে একটি জাহাজ নোঙর করে আছে। উত্তরপুবে সমুদ্রস্নানের সুন্দর বেলাভূমি। কাছেই ছোট ছোট ছবির মত কয়েকখানা বাড়ি।

অনেকক্ষণ আমি সেখানে চুপ করে বসে রইলাম। আমার চোখে

তখনও ঘুম ঘুম ভাব। যাহোক্, ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় দেহের জড়তা অনেকটা কেটে গেল। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। পা দুটি যেন ভারী হয়ে গেছে, এমনি মনে হচ্ছিল।

আমি অদূরে বাড়িগুলির দিকে চাইলাম। এতদিন পরে আবার খাবার কথা মনে হল। ডিম টোস্ট কফি খাওয়ার ইচ্ছা হল।…তার পরই ভাবলাম, আমার জিনিসপত্র, বিশেষ করে সোনার তাল দুটি কি করে লিম্পনিতে নিয়ে যাব।

আমি যে কোথায় আছি, বুঝতে পারছিলাম না। শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে এটা সমুদ্রের পূর্ব উপকূল। কারণ পৃথিবী স্পর্শ করবার আগে শূন্য থেকে আমি ইওরোপকে দেখেছিলাম।

এমন সময় একজন বেঁটে লোককে আমার দিকেই আসতে দেখা গেল। গোলগাল মুখ, ভদ্র চেহারা, কাঁধে তোয়ালে, হাতে সাঁতারের পোশাক। তাকে দেখেই মনে হল, আমি ইংল্যাণ্ডের উপকূলে আছি। লোকটি একদৃষ্টে আমাকে এবং গোলকটিকে দেখতে লাগল। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমার যে তখন পাগলের মত চেহারা, নোংরা পোশাক, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, উস্কখুস্ক চুল, এসব মনে ছিল না। সে গজ কুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার এ চেহারা কেন?" গোলকটি দেখিয়ে বলল, "ওই অদ্ভুত জিনিসটা কি?"

আমি তার উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম, "এই জায়গাটির নাম কি?"

"তুমি এখন লিটনস্টোনে আছ।" তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এই প্রথম এখানে এলে? তোমার ও জিনিসটা কি? কোন যন্ত্র নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি সমুদ্রে ভেসে এসেছ? জাহাজডুবিতে পড়েছিলে নাকি? ওটা কি জীবনতরীর মত কিছু নাকি?"

আমি আসল কথা ভাঙব না স্থির করে ভাসা ভাসা উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, ওই ধরনেরই কিছু। আমি তোমার সাহায্য চাই। আমার কিছু জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এগুলি আমি এখানে এমনি ফেলে রেখে যেতে পারি নে।"

এই সময় আরও তিনজন যুবক স্নানের পোশাক নিয়ে এদিকেই আসছে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক কি করতে হবে বল তো।" এই বলে সে যুবক তিনটিকে এদিকে আসবার জন্য ইশারা করল।

তারা পা চালিয়ে আমার কাছে এসে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

আমি বললাম, "তোমাদের প্রশ্নের জবাব পরে দেব। এখন আমি খুব ক্লান্ত।"

"তাহলে আমাদের হোটেলে এস। তোমার ওই অদ্ভুত জিনিসটির উপর আমরা নজর রাখব।"

স্বভাবতঃই আমি এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। খানিক ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললাম যে, গোলকটিতে সোনার দুটি বড় বড় ডাণ্ডা আছে।

আমার চেহারা দেখে তারা আমার কথা বিশ্বাসই করল না। বেগতিক দেখে আমি গোলকের ভিতরে ঢুকে সোনার ডাণ্ডা দুটি এবং সোনার ছেঁড়া শিকলটি বের করে আনলাম।

এতগুলি সোনা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, এগুলি আমি কোথায় পেয়েছি।

"চন্দ্রলোকে গেছিলাম। সেখান থেকে এনেছি।"

তাদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল দেখে আমি বললাম, "হোটেলে গিয়ে আমি সব কথা খুলে বলব। এখন দয়া করে এগুলি নিয়ে চল। আমি যেমন ক্লান্ত, তেমনি ক্ষুধার্ত। কিছু না খেলে আর চলছে না।"

"তোমার ওই গোলকটির কি হবে ?"

"ও এখন এখানেই থাক্। যদি জোয়ার আসে, তবে ভাসতে থাকবে। এর জন্য ভাবনা নেই।"

যুবক তিনটি আমার সোনার তালগুলি বয়ে চলল। আমিও তাদের সাথে সাথে হাঁটতে লাগলাম। এতদিন চন্দ্রলোকে এত লাফালাফি করে এসেছি, আর আজ পৃথিবীর মাটিতে চলতে গিয়ে পা দুটি এত ভারী মনে হতে লাগল, যেন কেউ তার উপর কয়েকমণ ভার চাপিয়ে দিয়েছে।

পথে একটা দুষ্টু ছেলের সাথে দেখা। সে সাইকেল চড়ে আসছিল। আমাকে দেখে সে খানিক দূর আমাদের সাথে এসেই সাইকেল চালিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমার ভয় হল, পাছে সে গোলকটির কাছে যায়, তার ভিতরে ঢুকে কোন গোলমাল করে। আমার সে আশঙ্কার কথা আমি বললাম। কিন্তু বেঁটে লোকটি আমাকে জোর দিয়ে বলল যে, আমার আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। ছেলেটা দুষ্টু বটে, তবে গোলকের কাছে যে কখনও যাবে না।

তখন আকাশে প্রভাতসূর্য তার অরুণাভা নিয়ে চারদিকে আবীর ছড়াচ্ছে। সে আলোর ছটায় সমুদ্রের জল লাল হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে আমার মনের অবসাদও দূর হতে লাগল। ভাবতে লাগলাম, আমার সমস্ত কাহিনী যখন পৃথিবীর সবাই শুনবে, তখন তারা বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। বাথরুমে ঢুকে অনেক দিন পর বেশ আরাম করে চান করলাম। বেঁটে লোকটিই দয়া করে তার এক সেট পোশাক আমাকে পরতে দিয়েছিল। তাই পরে প্রাতরাশের টেবিলে এসে বসলাম।

সামনে নানা রকমের সুখাদ্য। খাবার প্রবল আগ্রহ, কিন্তু তেমন খেতে পাচ্ছিলাম না। এ হয়তো আমার এতদিন না খেয়ে থাকার জন্য

তারা চারজন আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "সত্যই আমি চন্দ্রলোকে গিয়েছিলাম।"

"চন্দ্রে গিয়েছিলে! সত্যি বলছ?"

"সত্যি, যে চাঁদ তোমরা রোজ রাতে আকাশে দেখ, আমি সেই চন্দ্রলোকেই গিয়েছিলাম।"

"কি বলছ? এখন কি সেখান থেকেই এলে নাকি?"

"ঠিক ধরেছ। যে গোলকটি তোমরা ওখানে দেখে এলে, সেটা করেই মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে এলাম।"

বলতে বলতে একটা ডিম ভেঙ্গে মুখে দিলাম। ভালই লাগল। মনে মনে স্থির করলাম, আবার যখন চন্দ্রলোকে যাত্রা করব, তখন এক ঝুড়ি টাটকা ডিম নিয়ে যেতে হবে।

তারা আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তাদের মুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, তারা আমার কথার একবর্ণও বিশ্বাস করছে না। ভাবছে আমি এক নম্বর চালিয়াৎ। মিথ্যার বেসাতি দিয়ে ওদের তাক্ লাগাতে চাচ্ছি।

"তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ।" একজন হাসতে হাসতে বলল।

উত্তরে আমি শুধু বললাম, "টোস্ট কখানা আমার দিকে একটু এগিয়ে দাও না।"

এই বলে তার মুখ বন্ধ করলাম। কিন্তু সাথে সাথে আর একজন খোলাখুলিই বলল, "তোমার এই আজগুবি গল্প আমরা কেউ বিশ্বাস করছি না।"

"সে তোমাদের ইচ্ছে।"—বলে আমি খাবার দিকে মন দিলাম। এমন সময় হঠাৎ বাজ পড়ার মত শব্দ হল। আমরা সবাই চমকে উঠে জানালা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালাম।

যা ভয় করেছিলাম, ঠিক তাই হল। চোখের পলকে গোলকটি আকাশের দিকে উড়ে চলল।

রাগে আমি তখন আর আমাতে নেই। বললাম, "এ নিশ্চয়ই সেই দুষ্ট ছোকরার কাণ্ড। কি সর্বনাশই আমার হল।"

বলেই আমি সমুদ্রের দিকে ছুটলাম। আমার সাথে সাথে আর সবাইও ছুটল।

দেখতে দেখতে সমুদ্রতীর লোকে ভরে গেল। সবার মুখে এক কথা, আমি নিশ্চয়ই গোলকটি ফিরিয়ে আনবার উপায় জানি।

আমি যে তা পারি না, এ কথা কেউ বিশ্বাস করল না। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশ মনে আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

আমার গলা যেন শুকিয়ে গেল। হোটেলের বয়কে ডেকে কফির অর্ডার দিলাম। কফি খেয়ে মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে তাকে বললাম, "যাও সোনাগুলি আমার ঘরে নিয়ে এসো।"

সোনাগুলি আমার ঘরে এনে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর কাপড়চোপড় ছেড়ে দোরে তালা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

চন্দ্রলোকে অভিযানের সব চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল। সেখানে আবার যাবার সব পথ বন্ধ হল। কত আশা করেছিলাম, আবার সেখানে গিয়ে কেভরকে খুঁজে বার করব। দুজনে মিলে তাল তাল সোনা নিয়ে ফিরব। সব আশায়ই ছাই পড়ল। আমার সব সাধ সব স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। শুধু চন্দ্রলোকে অভিযানের একমাত্র জীবন্ত সাক্ষী হয়ে অকর্মা হয়ে বেঁচে রইলাম।

সেই দুষ্টু ছেলেটি নিশ্চয়ই গোলকটিতে প্রবেশ করে যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। হয়ত খড়খড়িগুলি খুলে দিয়েছিল। এই করতে করতে হঠাৎ কোন্ ফাঁকে হয়ত ঠিক সুইচটির উপর হাত পড়েছে, আর অমনি এই কাণ্ডটি ঘটেছে। সে যে আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারবে, সে আশা দুরাশা। গোলকে যে সামান্য খাবার অবশিষ্ট আছে, তাতে যে কয় দিন জীবন রক্ষা হয় হবে। তার পর—আর ভাবতে পারছিলাম না।

ছেলেটির বাপ মা যখন এসে কৈফিয়ৎ চাইবে, কি বলব ? এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব কতখানি ? গোলকের প্রবেশপথটি বন্ধ করে এলেই হয়ত এই বিপত্তি ঘটত না। আমারও এই সর্বনাশ হত না। আমারও কি সোজা ক্ষতি ! ছেলেটির বাপ মা এসে যদি চেঁচামেচি করে, তবে আমারও বলবার আছে—আমার গোলক আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ছেলেটির চিন্তা মন থেকে দূর করতেই আমার ঋণের চিন্তা আবার মাথায় এল। এখন যদি দাড়ি রেখে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য কোথাও থাকি তবে পাওনাদাররা আর তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবার সুযোগই হয়ত পাবে না।

এই ভেবে আমি ওখানকার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে একটা চিঠি দিয়ে জানালাম, তাঁর ব্যাঙ্কে আমি একটা একাউন্ট খুলব। লোক পাঠিয়ে যেন সোনাগুলি নেবার ব্যবস্থা করেন। চিঠির নীচে আমার ছদ্মনাম সই করলাম——"ব্লেইক্"। এরপর দর্জিকে ডেকে কিছু জামাকাপড়ের অর্ডার দিলাম।

এ সব সেরে বেশ পেট ভরে লাঞ্চ খাওয়া গেল। তার পর বসে বসে আরাম করে চুরুট টানতে লাগলাম।

ব্যাঙ্কের লোকও এসে গেল। তারা সোনাগুলি ওজন করে রসিদ দিয়ে নিয়ে গেল। আমি একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলাম।

কাপড় জামা তৈরী হতেই আমি হোটেলের পাট তুলে ইটালিতে পাড়ি দিলাম। সেখানে বসেই আমি এই কাহিনী লিখছি। আমার এ কাহিনী যদি কেউ বিশ্বাস না করে, ক্ষতি নেই, গল্প হিসাবেও তারা তা পড়তে পারবে। তাতে আর আমার কি !

কেভর যে খুব প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক ছিল, বা তার কেভরাইট আবিষ্কার একটা অসাধারণ কাজ, একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায়

না। লিম্পনিতে যে বাড়ি ঘর উড়ে গেল, লিট্‌লস্টোনেও যে এই বজ্র-গর্জন শোনা গেল, সবার বিশ্বাস, কোন বিস্ফোরক নিয়ে পরীক্ষার ফলেই তা হয়েছে। তাদের ধারণা আমাদের চন্দ্রলোকে অভিযান, বা সেখান থেকে এই সোনা আনা—সবই আষাঢ়ে গল্প। সোনাটা কোত্থেকে পেয়েছি, তা যাতে কাউকে বলতে না হয়, সে জন্যই এই আজগুবি গল্পের অবতারণা। তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে তারা থাকুক্, আমি কি করতে পারি!

আমার গল্প তো শেষ হল! এবার আবার সংসারের ঝামেলা শুরু হবে। চাঁদে যাই আর যাই করি, পেটের চিন্তা করতেই হয়। তাই এই এমাল্‌ফি শহরে বসে আবার আমার সেই নাটক লেখা শুরু করলাম। কেভরের সাথে দেখা না হলে কবেই তা শেষ হয়ে যেত!

কিন্তু লেখায় আর আগের মত মন বসাতে পারি না। ঘরে যখনই চাঁদের আলো পড়ে, তখনই সেই তাল তাল সোনার স্বপ্ন দেখি। কল্পনা করি, ঘরের টেবিল চেয়ার—সবই সোনার। যদি কেভরাইট্ তৈরি করতে পারতাম! কিন্তু জীবনে সুযোগ দুবার আসে না। তখন যদি কেভরের কাজকর্ম একটু মন দিয়ে দেখতাম, শিখতাম!

এখানে অবশ্য লিম্পনির চেয়ে খানিকটা ভালই আছি। কেভর হয়তো চন্দ্রলোকে আত্মহত্যা করেছে, নয়ত চন্দ্রবাসীদের হাতে বন্দী জীবন যাপন করছে। কে জানে? আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি স্বপ্নের মতই শেষ হল। সত্যিই স্বপ্ন বলেই যেন মনে হয়। শুধু সোনার তালগুলির কথা মনে পড়লেই বুঝতে পারি—এর সবটাই স্বপ্ন নয়।

কুড়ি

আমার লেখাটা শেষ করে এক প্রকাশকের নিকট তা পাঠিয়ে ভেবেছিলাম, "চন্দ্রলোকে প্রথম মানুষের" কাহিনী শেষ হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আমার ভুল ভাঙ্গল।

একদিন হঠাৎ এক অদ্ভুত খবর পেলাম। মিঃ জুলিয়াস ওয়েণ্ডিজি নামে এক ওলন্দাজ তড়িৎ-বিজ্ঞানবিদ্ চন্দ্রলোক থেকে কেভরের নানা অদ্ভুত সব বার্তা পাচ্ছেন।

আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার পাণ্ডুলিপি দেখে কেউ বুঝি আমার সাথে রসিকতা করছে। কাজেই আমি মিঃ ওয়েণ্ডিজিকে একটু ঠাট্টার সুরে একটা চিঠি লিখলাম। কিন্তু তার জবাব পেয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটার মধ্যে বিন্দুমাত্র রসিকতা নেই। তাই আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ ওয়েণ্ডিজির মানমন্দিরের উদ্দেশে রওনা হলাম।

সেখানে তাঁর যন্ত্রপাতি ও কাজকর্ম দেখে আমার সব সন্দেহের নিরসন হল। তাই তিনি যখন আমাকে তাঁর কাজকর্মে ও কেভরের বার্তা টুকে নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার প্রস্তাব করলেন, আমি বিনা দ্বিধায় সানন্দে রাজী হলাম। কেভরের বার্তা থেকে জানা গেল, সে শুধু জীবিতই নয়, চন্দ্রলোকে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে আছে। সেখানে সে বন্দী নয়, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করছে। একমাত্র একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা ছাড়া আর সব বিষয়েই খাসা আছে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকেই মিঃ ওয়েণ্ডিজি গ্রহান্তর থেকে তড়িৎবার্তা ধরবার জন্য গবেষণা করছিলেন। টাকা পয়সার তাঁর অভাব ছিল না। কাজেই তিনি নিজেই একটা মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন।

কেভর যখন চন্দ্রলোক থেকে তার বার্তা পাঠাতে শুরু করে, তার মাস দুই আগেই মিঃ ওয়েণ্ডিজির মানমন্দিরে নূতন যন্ত্রটি বসে

গেছে। কাজেই একবারে শুরু থেকেই কেভরের বার্তা মোটামুটি ধরা হয়েছে। কিন্তু এ সব বার্তা বিচ্ছিন্ন বার্তা মাত্র। তার সব বার্তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে মূল্যবান্—কেভরাইট তৈরীর নিয়ম—তাই এ পর্যন্ত ধরা গেল না। আমরাও কেভরকে আমাদের বার্তা পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন দিনই সফল হইনি। কাজেই আমরা কেভরের বার্তার মধ্যে কোন্‌টি পেয়েছি, কোন্‌টি পাইনি—তা সে জানতে পারেনি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যে অন্ততঃ একজন তার বার্তাগুলি ধরছে, এ সংবাদটুকু পর্যন্ত তাকে জানানো সম্ভব হয়নি।

মিঃ ওয়েণ্ডিজি যখন গ্রহান্তর থেকে তড়িৎবার্তা ধরা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখন হঠাৎ কেভরের বিশুদ্ধ ইংরেজী বার্তা পেয়ে তিনি যে কি রকম অবাক্ হয়েছিলেন, বলবার নয়। আমি ও কেভর যে চাঁদে গেছি, এ খবর তিনি জানতেন না। কাজেই মহাশূন্য থেকে এই ইংরেজী বার্তা পাঠান—এটা চমক লাগাবার মত ব্যাপার বই কি! আমাকে পেয়ে এবং আমার মুখে চাঁদে অভিযানের কাহিনী শুনে ব্যাপারটা তাঁর সম্পূর্ণ বোধগম্য হল।

যে করেই হোক্, কেভর চাঁদের রাজ্যে বেশ কিছু ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যোগাড় করেছে। শুধু তাই নয়, গোপনে গোপনে মার্কনি টাইপের ট্রান্‌স্‌মিটার সেট্‌ও বসিয়েছে। তা নিয়ে সব সময় কাজ করা হয়ত তার পক্ষে সহজ বা সম্ভব নয়। তাই থেকে থেকে তার কাছ থেকে বার্তা আসে। কিন্তু চাঁদের দেশের মত আমাদের যন্ত্রপাতি এত উন্নত নয় বলে আমরা সব বার্তা ঠিক ঠিক মত ধরতে পারিনে। যাও বা ধরা যায়, তাও সব সময় খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। আমরা হয়ত সবসুদ্ধ অর্ধেক বার্তা ধরতে পেরেছি। বাকী অর্ধেক পারিনি। অনেক সংবাদ ছাড়া ছাড়া। কাজেই আমি যে কেভরের বার্তার সারাংশ দিচ্ছি, তাও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন বা অসম্পূর্ণ মনে হবে।

কেভরের প্রথম দুটি বার্তায় সংক্ষেপে গোলক তৈরী ও তাতে করে চন্দ্রলোকে যাত্রার কথা বলা হয়েছে। তার ধারণা আমার মৃত্যু হয়েছে। চন্দ্রলোকে অভিযানে সেই আমাকে পীড়াপীড়ি করে মত করিয়েছিল বলে দুঃখ করেছে। বলেছে, "বেচারা বেডফোর্ড, এ রকম দুঃসাহসিক অভিযানে সঙ্গী হওয়ার মত যোগ্যতা বা মনোবল তার ছিল না। শুধু আমার প্ররোচনায়ই সে আমার সঙ্গী হয়েছিল।"

এখানে কেভর আমার প্রতি সুবিচার করেনি। গোলকটি হাতে-কলমে তৈরিতে আমার কোন অংশ ছিল না বটে, কিন্তু এটি তৈরী করতে আমি তাকে কম উৎসাহ দিইনি।

এর পরের বার্তায় সে আমার সম্বন্ধে আরও বেশী অবিচার করেছে। বলেছে, "অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা গেল, আমাদের চার পাশের বিচিত্র পরিমণ্ডলকে সহ্য করে নেবার মত মনের বল আমার সঙ্গীটির ছিল না। ফলে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সবার সাথে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি শুরু করে। বোকার মত সে চাঁদের কয়েকটি বিষাক্ত গাছ খায়, যার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং আমরা চাঁদের অধিবাসীদের হাতে ধরা পড়ি।"

কেভর নিজেও যে বিষাক্ত গাছগুলি খেয়েছিল, এখানে সে তার উল্লেখ করেনি। এটা নিশ্চয়ই তার ইচ্ছাকৃত ভুল। যাক্ এ নিয়ে আমি আর কোন কথা বলতে চাই না।

এর পর কেভর চাঁদের মানুষদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ, চাঁদের অভ্যন্তর থেকে কি করে আমরা চাঁদের পীঠে আসি এবং আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তার বর্ণনা দিয়েছে। বলেছে, "আমি একদল চাঁদের মানুষের সামনে পড়লাম। তাদের মধ্যে দুজনকে দলপতি বলে মনে হল। তাদের মাথাগুলি দেহের তুলনায় বেশ বড়। তাদের এড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই আমি একটা গর্তে পড়ে গেলাম। আমার মাথা ফেটে গেল, হাঁটুতে বেশ আঘাত পেলাম। এই ভাঙা হাঁটু নিয়ে খোঁড়াতে

খোঁড়াতে কিছুদূর গিয়ে আর হাঁটতে পারলাম না। তাই বাধ্য হয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তারা আমার অবস্থা দেখে আমাকে কাঁধে করে চাঁদের একেবারে অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

বেড্‌ফোর্ডের কোন খবরই আমি পাইনি। হয়ত রাতের তুষারে তার মৃত্যু হয়েছে, নয়ত সে গোলকটি খুঁজে পেয়ে তাতে চড়ে চন্দ্রলোক ত্যাগ করেছে। পৃথিবীতে সে ফিরে যেতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভবতঃ সে মহাশূন্যেই ভাসতে ভাসতে শেষে একদিন মরণের কোলে ঢলে পড়েছে।"

এর পর থেকে কেভর আর আমার কথা কিছু বলেনি। সে জানাচ্ছে, চাঁদের মানুষেরা তাকে একটা প্রকাণ্ড গহ্বরের কাছে নিয়ে গিয়ে একটা বেলুনের মধ্যে পুরে দিল। আর বেলুনটা বেশ বেগে নীচে নামতে লাগল। চাঁদে এমন অসংখ্য গহ্বর আছে—তাদের এক একটা প্রায় একশো মাইল গভীর। সুড়ঙ্গপথে এই গহ্বরগুলির একটার সাথে আর একটার যোগ রয়েছে। সারা চন্দ্রলোকের একশো মাইল পর্যন্ত কেবল এই ধরনের গহ্বর আর সুড়ঙ্গ। তাই চাঁদের এই অংশ স্পঞ্জের মত ফোঁপরা। এই গহ্বর আর সুড়ঙ্গগুলির কতকগুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, বাকী বেশীর ভাগই চাঁদের মানুষের কীর্তি।

কেভর প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ শুধু নিরেট অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলল। তারপর আস্তে আস্তে আলো দেখা দিল এবং সেই আলোর উজ্জ্বলতাও ক্রমেই বাড়তে লাগল। কেভর আরও লক্ষ্য করল যে, চাঁদের মানুষগুলিও যেন আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবশেষে যেখানে গিয়ে সে থামল, সেখানে শুধু আলোর সমুদ্র, চারদিক থেকে আলোর স্রোত সেখানে এসে মিশেছে। অথচ আশ্চর্য, সেই আলোর কোন উত্তাপ নেই।

কেভর তার পরবর্তী বার্তায় জানাচ্ছে, "চাঁদের মানুষেরা তাদের একটা নৌকায় করে আমাকে এই আলোক সমুদ্রে খানিক দূর নিয়ে

গেল। এখানকার গুহা এবং পথগুলি প্রায়ই আঁকাবাঁকা। বহু চন্দ্রবাসী এখানে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।

চাঁদের দেশে যে সব শহর আছে, তাদের সবগুলিই এই আলোক সমুদ্রের ঠিক উপরে বড় বড় গুহার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের পিঠে যারা থাকে, তাদের সাথে এখান থেকে যোগাযোগের পথ হচ্ছে বিরাট বিরাট সুড়ঙ্গ, পৃথিবীর জ্যোতির্বিদেরা যার নাম দিয়েছেন, আগ্নেয়গিরির মুখ বা ক্রেটার।

এই ক্রেটার ও ছোট ছোট গাছপালার প্রধান কাজ হচ্ছে, চাঁদের বায়ুমণ্ডলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা। এক সময় তো আমার কাছে বাতাস বেশ ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছিল। তারপর আবার ভিজে গরম বাতাস উপরের দিকে উঠছে, টের পেলাম।"

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাকে বলেছেন, তাঁরা চাঁদের সম্বন্ধে এ যাবত যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কেভরের এই বর্ণনার সাথে তার বেশ মিল আছে। মিঃ ওয়েণ্ডিজি বলেন, "আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যদি আরও একটু সাহস ও কল্পনাশক্তি থাকত, তবে কেভর এখন যে সকল তথ্য পাঠাচ্ছে, তা তাঁরা আগেই বলতে পারতেন। তাঁরা আজকাল ভাল করেই জানেন, চাঁদ পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ দুই-ই একই ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরী। চাঁদের ঘনতা পৃথিবীর ঘনতার মাত্র পাঁচ ভাগের তিন ভাগ। কাজেই তার মধ্যে এমন গহ্বর আর সুড়ঙ্গ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আর চাঁদ যদি এমন ফোঁপরা হয়, তবে সেখানে বাতাস বা জলের যে অস্তিত্ব থাকবে না, সেটা সহজেই বুঝা যায়। চাঁদের গভীরে রয়েছে সমুদ্র, কাজেই গহ্বর ও সুড়ঙ্গ মুখে বাতাসের চলাচল হবে, এও স্বাভাবিক। চাঁদের যে দিকটা সূর্যের দিকে, সেদিকের বাতাস সহজেই গরম হয়ে ওঠে, কাজেই যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে না, সেই দিকের ঠাণ্ডা বাতাস যখন জমতে শুরু করে তখন সেই গরম বাতাস প্রকৃতির নিয়মের এই সুড়ঙ্গপথে বইতে থাকে। তাই সুড়ঙ্গপথে বাতাসের চলাচলের কোন সময়ই অভাব হয় না।

বাইশ

আমি আগেই বলেছি যে, আমি যে সব চাঁদের মানুষ দেখেছি, তাদের সাথে পৃথিবীর মানুষের শুধু এইটুকু মিল আছে যে, তারা সোজা হয়ে হাঁটে, তাদের দুটি হাত, দুটি পা আছে। তবে তাদের চেহারা অনেকটা পোকার মত। কেভরও তার বার্তায় আমার এই মত সমর্থন করেছে। তার মত এই যে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম হওয়ায় সেখানে কতকগুলি পোকা মানুষের মত লম্বা হতে পেরেছে। তার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শক্তি বুদ্ধি ও পরিশ্রম ক্ষমতার দিক থেকে তারা অনেকটা আমাদের পিঁপড়ের মত। পিঁপড়ের মতই তাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ কর্মী ও যোদ্ধা আছে। এই সব চাঁদের মানুষের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য নানা রকমের। আমি যাদের দেখেছি তারা চাঁদের বাইরের দিকের বাসিন্দা, তাদের বেশীর ভাগের কাজই ছিল রাখালি বা কসাইগিরি। কিন্তু কেভরের মতে চাঁদের অভ্যন্তরের যারা অধিবাসী, তারা আকৃতি, শক্তি ও চেহারা সব দিক দিয়েই পৃথক্। কেভরকে যারা বেলুনে তুলেছিল, তারা এই শ্রেণীরই অধিবাসী।

কেভর জানাচ্ছে, "কত লোক যে আমার আশেপাশে জড় হল, তার সংখ্যা বলা কঠিন। তাদের কারও সঙ্গে কারও চেহারা বা আকারে মিল নেই। তবে তাদের প্রত্যেকেরই একটি না একটি অঙ্গ বেমানানভাবে বড়। কারও বাহু হয়তো অস্বাভাবিক লম্বা, কারও শুধু পা দুখানিই সার, কারও প্রকাণ্ড চেপটা মাথা, কারও মাথা ছুঁচালো। কারও মাথা এত বড় যে মনে হয়, মাথায় বুঝি একটি বেলুন বসানো।

এদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। আমাকে দেখবার জন্য এদের কি আগ্রহ। সে জন্য এরা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। আগেই বলেছি, আমি ভাল করে হাঁটতে পারছিলাম না। তাই

তারা আমাকে একটা চতুর্দোলায় শুইয়ে কাঁধে করে নিয়ে চলল। আমার চারদিকে এদের মাথা, চোখ, মুখ আর শিরস্ত্রাণ। সবাই এক সাথে কথা বলছে—ফলে গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে এনে একটি ছ'কোনা ঘরে রাখল। সেখানে কয়েকদিন বন্দীদশায় কাটল। তারপরই ইচ্ছামত চলাফেরার স্বাধীনতা পেলাম। চন্দ্রলোকের যিনি সম্রাট্, তাঁর আদেশে দুজন চন্দ্রবাসী আমার দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত হল। তাদের দুজনেরই মাথা অসম্ভব বড়—সারা শরীরে শুধু মাথাটিই সার, এমনি চেহারা। তাদের কাজ হল আমার সব কাজকর্ম করে দেওয়া আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলা। শুনলে অবাক্ হবে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পৃথিবীর মানুষের ভাষায় কথা বলতে শিখল।

আমি এদের নাম দিয়েছি, ফি-উ আর সি-পুফ্। ফি-উর ছোট্ট শরীরের উপর প্রকাণ্ড মাথা। সি-পুফের মুখটি প্রকাণ্ড বড়, আর মাথাটি ন্যাসপাতির মত লম্বাটে। এরা দুজনেই আমার ঘরে এলে আমি যা বলতাম, তা বেশ মন দিয়ে শুনত। তারপর তারা আমার অনুকরণে তা বলবার চেষ্টা করত। তাদের এই মতলব বুঝতে আমার দেরি হল না। আমি তখন একই কথা বার বার করে বলতাম এবং কোন্ জিনিসের কথা বলছি, তা ছবি এঁকে বুঝাতে চেষ্টা করতাম। অল্প দিনের মধ্যেই ফি-উ আমার সাথে কথা বলতে শিখল।

যে দুটি কথা সে প্রথম শিখল, তা হচ্ছে 'মানুষ' আর 'চন্দ্রবাসী'। ফি-উ যখন যে কথাটি শিখত, অমনি সে তা সি-পুফ্‌কে শিখাত। তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার একটি কথা শুনেই সে তা মনে রাখতে পারত। আমার ধারণা, চাঁদের মানুষের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দুইই পৃথিবীর মানুষের চাইতে অনেক বেশী। কয়েক দিনের মধ্যে তারা প্রায় শ'খানেক কথা শিখে ফেলল। যাতে তারা আরও তাড়াতাড়ি শিখতে পারে, সে জন্য তারা একজন চিত্রকরকেও নিয়ে এল, যাতে সে পরিষ্কার ছবি এঁকে আমার কথাটি বুঝাতে পারে।

যতই হোক, আমি তো আর চিত্রকর নই, কাজেই আমার আঁকা ছবি তেমন সুন্দরও হত না, ভাল বুঝাও যেত না।

দিন কয়েকের মধ্যেই চাঁদের মানুষেরা পৃথিবীর মানুষের ভাষা বেশ ভাল করেই শিখে ফেলল। তখন তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে আমার আর কোন অসুবিধাই রইল না। অবশ্য গোড়ার দিকে এটা খুব সহজ ছিল না। আমার কথা তাদের বুঝাতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, তারা আমার সাথে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বেশ ভাল ভাবেই বলতে শিখল। চাঁদের মানুষ পাখির মত কিচিরমিচির করে তারা পৃথিবীর মানুষের ভাষা বলছে, প্রশ্ন করছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—এ আমার বেশ ভালোই লাগছে।"

কেভর যখন এদের পৃথিবীর মানুষের ভাষা শিখাচ্ছে, তখন তার চলাফেরার স্বাধীনতা আরও বেড়ে গেল। সে সময়েই সে বেতারবার্তা প্রেরণের যন্ত্রটি বসিয়ে পৃথিবীতে বেতারবার্তা পাঠাতে শুরু করেছে। যদিও ফি-উকে সে পরিষ্কার জানিয়েছিল যে, সে পৃথিবীতে খবর পাঠাচ্ছে, তবুও তার কাজে কেউ কোন বাধা দেয়নি।

নীচে যে খবর দেওয়া হচ্ছে, তা তার নবম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ বার্তা থেকে নেওয়া। এর থেকে চাঁদের অধিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে কতকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

কেভর জানাচ্ছে, "চন্দ্রলোকের অধিবাসীদের প্রত্যেকেই বেশ ভাল করেই জানে, সমাজে তার স্থান কোথায়। সেখানেই তার জন্ম, এবং যাতে তার কাজ সে ঠিকমত করতে পারে সেজন্য প্রথম থেকেই তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন ধর, একজনকে অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে হবে। তার শিক্ষকগণ তাকে এমন ভাবে গড়ে তুলবে যাতে অঙ্ক ছাড়া তার মন আর কোন দিকে না যায়। অঙ্ক ছাড়া আর তাকে কিছু করতে দেওয়া হবে না, অন্য দিকে তার মন গেলে সেখান থেকে তার মনকে ফিরিয়ে

আনা হবে। ফলে তার মাথাটা কেবলই বেড়ে যাবে, আর হাত পা সব শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে যাবে। সে হবে মাথা-সর্বস্ব ক্ষীণদেহ জীব।

তেমনি যদি কাউকে রাখালি করতে হয়, তবে তার শরীর হবে শক্ত মজবুত, স্বভাব হবে কর্মঠ। রাখালিতেই যাতে আনন্দ পায় তার মনকে সে ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হবে। সে চাঁদের পিঠের দিকেই থাকবে, ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা জানবার তার মোটে আগ্রহই থাকবে না। চাঁদের জানোয়ার চরানোই হবে তার একমাত্র আনন্দ। এ দিক দিয়ে ভাবলে চন্দ্রলোকের শিক্ষাপদ্ধতি বেশ ভালোই বলতে হয়।

যাদের মাথা বড়, চাঁদের রাজ্যে তারাই অভিজাত সম্প্রদায়ের। তাদের সর্বাধিনায়ক হচ্ছেন চন্দ্র-সম্রাট্। শীগগিরই তাঁর সাথে আমার দেখা হবে। এই অভিজাত শ্রেণীর মস্তিষ্কের এমন চমৎকার বিকাশের কারণ, তাদের মাথার খুলি শক্ত নয়।

অবশ্য চাঁদের মানুষের বেশীর ভাগই হচ্ছে মজুর। এদের মধ্যে এক দলের কাজ শুধু ঘণ্টা বাজান, তাদের কান হাতির কানের মত। যারা রসায়নবিদ তাদের নাক লম্বা। যারা কাচের নল তৈরি করে তাদের শরীরে ফুসফুসটাই সব চেয়ে বড়। এদের যারাই যে কাজ করুক না কেন, বেশ মন দিয়ে নিখুঁতভাবে করে। এদের মধ্যে যারা আকারে নেহাতই ছোট, তারাও সূক্ষ্ম কাজে ওস্তাদ। এরা এত ছোট যে, আমার মুঠোর মধ্যেই এদের পুরে ফেলতে পারি। আবার এই সব কর্মীদের কাজের যারা দেখাশোনা করে, তাদের চেহারা বেশ দশাসই। এরা হচ্ছে চাঁদের পুলিস।

মাঝে মাঝে আমি একটা ছায়াশীতল গুহার পাশ দিয়ে আমার ঘরে ফিরি। এটা যেমন ঘিঞ্জি, এখানে তেমনি হট্টগোল। এখানেই থাকে চাঁদের দেশের মেয়েরা। এরা হচ্ছে মৌচাকের মক্ষীরানীর মত। এদের চেহারা বেশ সুন্দর, সাজ-পোশাকও ভাল। তবে এদের মাথাগুলি খুবই ছোট। নিজেদের ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষমতা

পর্যন্ত এদের নেই। তাই একটু বড় হতে না হতেই এদের শিশুদের মানুষ করার ভার দেওয়া হয় একদল কুমারী মেয়েদের উপর। এদের মেয়েকর্মী বলা চলে। এদের মাথাও কর্মী পুরুষদের মতই বড়।”

এখানেই হঠাৎ তারবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। যদিও এই বিবরণ অসম্পূর্ণ তবুও এ থেকে চাঁদের দেশের বিচিত্র মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি কোন দিন চাঁদের দেশের মানুষদের সংস্পর্শে আসতে হয়—জানি না সে দিন কবে হবে—তবে এই অসম্পূর্ণ তথ্যও অনেক কাজে লাগবে।

তেইশ

এর পর কেভরের যে বার্তা পাওয়া গেল, তাতে সে চন্দ্র-সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছে। দুঃখের বিষয় তার এই বিবরণের শেষ অংশ এসে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। মনে হয় শেষ দিকে বোধ হয় কোন বাধা পড়েছে। কেভর জানাচ্ছে—

“আমরা চন্দ্র-সম্রাটের গুহার দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ভিড়ও ততই বাড়ছে। আমাকে একটা চতুর্দোলা করে নেওয়া হয়েছে। আমার চারদিকে অগুনতি চাঁদের মানুষের ভিড়। প্রথমে চলছে চারজন শিঙা-মুখো মানুষ। তাদের মুখে সে কি বিকট আওয়াজ। দুপাশে চলছে পণ্ডিতের দল। ফি-উ আমাকে বলল যে, আমি যা বলব, চাঁদের সম্রাটকে তারা তা বুঝিয়ে বলবে। ফি-উ এবং সি-পুফ্ আমার আগে আগে চলছে। তারাও চতুর্দোলায়। তার পর আমার চতুর্দোলা—চমৎকার কারুকার্য করা। আমার পিছনে বড় বড় মাথাওয়ালা মানুষ, তারা অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। চন্দ্র-সম্রাটের সাথে আমার সাক্ষাতের সমস্ত খুঁটিনাটি ওরা মনে করে রাখবে। চাঁদের দেশে বইপত্র নেই, পাঠাগার নেই। এরাই হচ্ছে স্মৃতির ভাণ্ডারী, চাঁদের দেশে যখন যা ঘটে, এদের মাথার মধ্যেই তা

দেখি বিরাট এক কারখানা

থাকে। রাস্তার দুপাশে অফিসারদের সারি, তার পর দুচোখ যতদূর যায় অগুনতি চাঁদের মানুষ।

আমরা একটা ঘোরা পথ দিয়ে খানিক দূর গেলাম। তার পর খুব সুন্দর করে সাজানো বড় বড় কয়েকটা হল ঘর পেরিয়ে এলাম। এক একটা গহ্বর পিছনে ফেলে আর একটা বড় গহ্বরে প্রবেশ করছি।

এই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ভারী নোংরা ও বেমানান মনে হতে লাগল। অনেক দিন দাড়ি গোঁফ কামানো হয়নি, কাপড়-চোপড়ও ময়লা। পৃথিবীতে থাকতে সব ব্যাপারেই নেহাত যতটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশী নিজের দিকে নজর দিইনি। কিন্তু আজ চাঁদের দেশে এই শোভাযাত্রা করে যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগল, এখানে আমি পৃথিবী ও তার মনুষ্যসমাজের প্রতিনিধি। কাজেই আমার পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সভ্য ভব্য হওয়া উচিত ছিল। আমার ফ্ল্যানেলের কোট, ছেঁড়া ট্রাউজার, একটা মোটা কম্বল দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই হতচ্ছাড়া পোশাক পরে চাঁদের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমি পৃথিবীর মানুষদের প্রতি খুবই অবিচার করছি। কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না।

কল্পনা কর, একটা বিরাট হল-ঘর। সবুজ আলোর ক্ষীণ আভায় তা আলোকিত। এর পর এর চাইতেও বড় বড় অনেকগুলি হল-ঘর পেরিয়ে আমরা এসে থামলাম বিরাট এক ধাপ সিঁড়ির সামনে। সেই সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে সিংহাসন পর্যন্ত। আর সেই সিংহাসনে বসে আছেন চন্দ্র-সম্রাট্।

সিংহাসনের চার পাশে উজ্জ্বল সবুজ আলো। সম্রাটের মাথাটির পরিধি অন্ততঃ কয়েক গজ হবে, এমনি বড়। তার সিংহাসনের পিছন থেকে কয়েকটি সবুজ সার্চলাইট চারদিকে সবুজ আলো ছড়াচ্ছিল। তার মাথার চার দিকে জ্যোতির্ময় আলোকমণ্ডল। কয়েকজন

দেহরক্ষী তাঁর মাথাটি ধরে আছে। আর একটু নীচে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী। আর এই অসংখ্য সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে শাস্ত্রীর দল। তার পর অগণিত সভাসদ্।

দরবার হলের আগের হলটিতে ঢুকতেই কানে এল মধুর সংগীত। সব হই হট্টগোল বন্ধ হল। এর পর দরবার হলে প্রবেশ করলাম। ঘোষক ও প্রহরীরা ডাইনে বাঁয়ে দাঁড়াল। আর ফি-উ, সি-পুফ্ ও আমার চৌদোলা তিনটি সেই বিরাট সিঁড়ির কাছে নামান হল। হাজার দশেক লোক চন্দ্র-সম্রাট্‌কে অভিবাদন জানাল।

আমি যখন প্রথম সম্রাট্‌কে দেখলাম, মনে হল যেন একটা পাতলা রবারের ব্লাডার এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে। তারই ঠিক নীচে সিংহাসনের দুপাশে দুটি ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ পিটপিট করছে। মুখ বলে কিছু নেই, শুধু চোখ দুটি আছে। চোখের নীচে ছোট্ট শীর্ণ শরীর, আর লতার মত লম্বা সরু সরু দুটি হাত। এই ক্ষুদে চোখ দুটি অপলক ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল।

এই চাঁদের সম্রাট্! এরই ইচ্ছায় এখানকার সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়! একদিক থেকে এর মহিমা সত্যই বিরাট। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। ভাবতে ভাবতে আমি সব ভুলে গেলাম—সেই দরবার, দরবারের অসংখ্য মানুষ—সবই আমার মন থেকে মুছে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। দেখলাম, পরিচারকের দল সম্রাটের মাথায় কি একটা স্নিগ্ধ সুগন্ধি জলের ধারা দিচ্ছে। আমি শক্ত করে চৌদোলাটি ধরে বসে একদৃষ্টে চন্দ্র-সম্রাটের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর সিংহাসন থেকে ধাপ দশেক নীচে যখন এলাম, তখন সংগীত বন্ধ হল। দেখলাম সম্রাট্ তখনও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। চন্দ্র-সম্রাটের সামনে পৃথিবীর প্রথম মানুষ! অজানা ভয়ে যেন শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আবার সে ভয় দূরও হল।

আমাকে চৌদোলা থেকে নামান হল। সঙ্গীদের ইঙ্গিতে সম্রাট্‌কে অভিবাদন করলাম। তারপর আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে সব পণ্ডিতেরা আমার সাথে সাথে এসেছে, তারা আমার চেয়ে দু'ধাপ উপরে গিয়ে দাঁড়াল। কি-উ আমার আর সিংহাসনের মাঝামাঝি জায়গা নিল। সি-পুক্‌ রইল তার পিছনে।

আমার কানে এল খুব ক্ষীণ একটা স্বর। চন্দ্র-সম্রাট্‌ আমাকে কি বলছেন। মনে হচ্ছে, কাচের উপর যেন কেউ নখ ঘষছে।

আমি খুব মন দিয়ে তাঁর কথা শুনবার চেষ্টা করলাম। তারপর কি-উর মুখের দিকে চাইলাম। সে কি ভাবল, সি-পুক্‌কে কি বলল, তারপর আমাকে বলল, 'সম্রাট্‌ পৃথিবী গ্রহ থেকে আগত তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তিনি তোমাদের গ্রহের সব কথা জানতে চান। আর জানতে চান, তুমি কেন এখানে এসেছ।'

আমি উত্তর দিতে যাব, এমন সময় সি-পুক্‌ বলল, 'চন্দ্রলোকের জ্যোতির্বিদদের মুখে সম্রাট্‌ শুনেছেন যে, তোমাদের ভূ-পৃষ্ঠেই জল-বায়ু আছে এবং তোমরাও ভূ-পৃষ্ঠেই বাস কর। তিনি এ সম্বন্ধে তোমার মুখ থেকে বিশদ বিবরণ শুনতে চান।' সূর্যের আলোতে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না শুনে তিনি যেন অবাক্‌ই হলেন। আমি যখন বুঝাতে চেষ্টা করলাম আমাদের আকাশ নীল, তাতেও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, মানুষের চোখ এমন ভাবেই তৈরী যে দরকার হলেই সে তা অনায়াসেই বন্ধ করতে পারে। তিনি যাতে আমার চোখটি ভাল করে দেখতে পান, সে জন্য তাঁর ইঙ্গিতে আমি তাঁর একবারে কাছে গেলাম।

সম্রাট্‌ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রোদ বৃষ্টি জল ঝড়ের হাত থেকে আমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করি। আমি তাঁকে আমাদের বাড়িঘর তৈরী ও তা জিনিসপত্র দিয়ে সাজানোর কথা বললাম। বাড়ি যে কি জিনিস তা তাঁকে বুঝাতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হল। মানুষ পৃথিবীর অভ্যন্তরে গুহায় না থেকে, বাড়িঘরে বাস করে কেন, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তাই আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের এত জায়গা দিয়ে আমরা কি করি। আমাকে বার বার বলতে হল যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত চার হাজার মাইলের মধ্যে মাত্র মাইল খানেকের খবর আমরা রাখি। আর সে খবরও ভাসা ভাসা খবর। সম্রাট্‌ আশ্চর্য হয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে এত জায়গা পড়ে থাকতে আমার চাঁদে আসার কারণ কি?

তারপর তিনি পৃথিবীর আবহাওয়ার খবর জানতে চাইলেন। রাতে আমাদের বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডায় জমে যায় কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, সেখানে কোন দিনই এত বেশী ঠাণ্ডা পড়ে না। কারণ চাঁদের রাতের তুলনায় সেখানকার রাত অনেক ছোট। তখন ঘুমের কথা উঠল। চাঁদের মানুষ কালেভদ্রে বিশ্রাম করে, তাও যদি কোন কঠিন পরিশ্রম করে তবে। নইলে ঘুমের তাদের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। আমাদের যে রোজই রাতে ঘুমোতে হয়, একথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না। কথায় কথায় আমি রাতের শোভার বর্ণনা করলাম। তা থেকে নিশাচর হিংস্র প্রাণীদের কথা উঠল। বললাম যে, তারা রাতে শিকারে বের হয়, দিনে পড়ে ঘুমায়। হিংস্র প্রাণী যে কি, তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। শত চেষ্টা করে আমিও বুঝাতে পারলাম না। কারণ চাঁদে কোন হিংস্র প্রাণী নাই।

তিনি তখন তাঁর সভাসদ্‌দের সঙ্গে কি বলাবলি করলেন। তারপর আমাকে বললেন, 'তোমাদের সবই আজব ব্যাপার। তোমরা জল ঝড় হিংস্র জন্তু এসব নিয়ে ভূপৃষ্ঠে বাস কর, অথচ পৃথিবী গ্রহের অভ্যন্তরে এত জায়গা খালি পড়ে থাকতেও সেখানে বাস করতে পার না। অথচ এদিকে আবার আমাদের গ্রহ আক্রমণ করবার ফিকিরে আছ।'

আমি বললাম যে আক্রমণ আমার বা পৃথিবীর মানুষের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। তিনি তা বিশ্বাস করলেন কিনা বুঝা গেল না।

তারপর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবীতে যে নানা ধরনের নানা জাতির মানুষ আছে, সে কথা বললাম। তিনি শুনে বললেন, 'তোমাদের সব মানুসই সব রকম কাজ করে? তাহলে চিন্তা-ভাবনা করা, দেশ শাসন করা—এগুলি কে করে?''

আমাদের শাসন-ব্যবস্থা যে কি রকম তা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। এত কথা শুনে শুনে হয়ত তাঁর মাথা গরম হয়ে গেছিল। তাই তিনি আবার তাঁর মাথায় সুস্নিগ্ধ শীতল জলের ধারা দিবার আদেশ দিলেন। তারপর আমাদের শাসন-ব্যবস্থার ব্যাপারটা আরও বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলতে বললেন।

আমি বললাম যে, আমাদের মধ্যেও সব মানুষ ঠিক একই রকম নন, তাদের গুণও এক রকমের নয়। কেউ চিন্তাবিদ্, কেউ শাসক, কেউ শিকারী, কেউ যন্ত্র-কুশলী, কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, আবার কেউ কেউ বা দিন-মজুর। তবে শাসন ব্যাপারে সরাসরি বা গৌণ ভাবে সবারই হাত আছে।

'ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য তাদের চেহারাও কি ভিন্ন ভিন্ন নয়?'—সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন।

'তা হবে কেন? তবে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা অবশ্যই এক রকম নয়।' আমি বললাম।

'তাদের মন নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হবে। নইলে সবাই তো একই কাজ করতে চাইবে।'

আমি বললাম তাঁর কথা কতকটা সত্যি। পৃথিবীর মানুষও একজন হুবহু আর একজনের মত নয়—না দেখতে, না মনের দিক থেকে।

'কিন্তু তুমি যে বললে, তোমাদের শাসন ব্যাপারে সবারই কিছু না কিছু অংশ আছে।'

'সেটা ঠিকই।' এই বলে আমি তাঁকে আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি বুঝাবার চেষ্টা করলাম।

তিনি বললেন, 'তা হলে তোমাদের গ্রহে একজন গ্রহপতি নেই, যিনি সমস্ত গ্রহ শাসন করেন?'

'অনেক আগে রাজা মহারাজারা ছিলেন। এখন সে সবের পাট উঠে গেছে। এখন গণতন্ত্রের যুগ। এ যুগে শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই সমান অধিকার।'

'কিন্তু তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি যোগায় কে?'

আমি বুঝিয়ে বললাম, আমাদের বড় বড় লাইব্রেরী আছে, নানা বই আছে। তা পড়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। তাছাড়া আমাদের বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা তাঁদের সাধনা ও গবেষণায় নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করছেন। তিনি স্বীকার করলেন, আমাদের সামাজিক অবস্থা যাই হোক, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে বেশ উন্নত হয়েছি, তা নইলে আমার চাঁদে আসাই সম্ভব হত না।

তিনি আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থার কথাও জানতে চাইলেন। আমি আমাদের রেলগাড়ি, জাহাজ এবং সম্প্রতি বিমান-যোগে

যাতায়াতের কথা বললাম। তিনি শুনে অবাক হলেন যে মাত্র একশো বছর আগে আমরা বাষ্পের ব্যবহার শিখেছি। এখনও আমরা এক শাসনতন্ত্রের অধীন হতে পারিনি। এখনও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র আছে, তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়, নানা দেশে নানা ভাষা—এসব তার কাছে অবিশ্বাস্য সংবাদ বলে মনে হল! এক এক দেশের ভাষা এক এক রকম হলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কি করে কথাবার্তা বলি তা জানতে চাইলেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। কেমন করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধে, কেমন করে কামান বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, বিমান, আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে প্রথমে যুদ্ধের প্রস্তুতি হয়, কেমন করে এক দেশের সৈন্য আর এক দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা দখল করে সবই বিস্তৃতভাবে বললাম। কত রকম মারণাস্ত্র যে আবিষ্কৃত হয়েছে তা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন। যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষতি প্রাণহানি হয় শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবুও তোমরা যুদ্ধ কর? যুদ্ধ তোমাদের ভালো লাগে? কি লাভ হয় এতে?'

আমি বললাম, 'ভালো লাগে কিনা বলা শক্ত। তবে যারা জেতে তাদের লাভ হয় বই কি? অন্তত পৃথিবীর লোকসংখ্যা সাময়িকভাবে কমে।'

'এটা কোন কাজের কথাই নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সমুদ্রের তলায় তোমাদের এত সম্পদ রয়েছে, কোথায় সবাই মিলে তা খুঁজে বার করবে, সবাই মিলে তা ভোগ করবে তা না করে তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করবে, তাহলে তোমাদের আর হিংস্র পশুদের মধ্যে প্রভেদ রইল কোথায়?"

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে, মানুষ এখনও অতটা উদারভাবে ভাবতে শেখেনি। তাদের মধ্যে এখনও সংকীর্ণ স্বার্থবোধ রয়ে গেছে। বিশ্বমানবতার শিক্ষা নিতে এখনও দেরি আছে।

এইখানে কেভরের প্রেরিত সংকেত আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। মনে হল, কেউ যেন ইচ্ছে করেই বাধা সৃষ্টি করছে যাতে তার সংবাদ পৃথিবীতে এসে না পৌঁছায়। তারপর আবার কয়েকটা সংকেত বোঝা গেল, আবার তা বন্ধ হল। ফের শুরু হল। কাজেই মাঝের কিছুটা বাদ দিয়ে আবার আমরা কেভরের বার্তা ধরতে পারলাম।

কেভর বলছে, "...আমার আবিষ্কার সম্বন্ধে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, তারা অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেলেও এ যাবৎ কেভরাইট্ আবিষ্কার করতে পারেনি। তারা বিষয়টা এমনিতে জানে, কিন্তু কি করে তা তৈরি করতে হয়, এ পর্যন্ত তা বার করতে পারেনি। চাঁদে হিলিয়াম নেই, অথচ হিলিয়াম ছাড়া"—

এখানে আবার ছেদ পড়ল। বাকীটুকু আর শোনা গেল না। আবার হয়ত চন্দ্রলোকের মানুষ কোন রকম নূতন বাধার সৃষ্টি করছে, যাতে তার বার্তা এসে আমাদের কাছে না পৌঁছায়।

চব্বিশ

কেভরের সপ্তাংশ বার্তার শেষাংশ এই ভাবে হারিয়ে গেল। আমরা তা জানতেও পারলাম না।

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে লাগলাম, সেই নির্বান্ধব চন্দ্রলোকে নীলাভ ছায়ায় বসে কেভর একমনে পৃথিবীতে তারবার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। সে জানতেও পারছে না যে, তার শত্রুরা তার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। তার সব বার্তা আমরা ধরতে পারছি না। বেচারা সোজা সরল মানুষ, মনের মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। সে বুঝতেও পারছে না, তার এই সরলতা তার কি বিপদ ডেকে আনছে। যুদ্ধের কথা, মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তির কথা, মানুষের মূঢ়তার কথা সে কেন এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে গেল। তা না হয় বলল, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় বোকামি হল এ কথা বলা যে, পৃথিবীতে সেই একমাত্র মানুষ, যে এই পর্যন্ত কেভরাইট্ তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করতে পেরেছে। চন্দ্র-সম্রাট্ বুদ্ধিমান্। এর তাৎপর্য বুঝতে তাঁর মুহূর্তমাত্র দেরী হয়নি। তাই কেভর যাতে পৃথিবীতে কেভরাইট্ তৈরী সম্বন্ধে কোন বার্তা পাঠাতে না পারে, সম্রাটের আদেশে তার অনুচরেরা সেদিকে নজর রেখেছে। তাই তার-বার্তা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়েছে। কেভরও হয়তো তার বোকামির কথা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল। তার দুর্ভাগ্য যে ঘনিয়ে আসছে, এও তার অজানা হয়নি। কিন্তু এ জ্ঞান যখন হল, তখন তার আর কিছু করার উপায় ছিল না।

চন্দ্র-সম্রাট্ হয়ত কি করবেন তা স্থির করতে কিছুটা সময় নিয়েছিলেন। সে সময় হয়ত কেভরের স্বাধীনতায় কেউ কোন হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু তার পরই হয়ত তাকে আর তার যন্ত্রপাতির কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। তাই ক'দিন যাবতই আমরা তার কাছ থেকে কোন বার্তাই পাইনি।

তারপর হঠাৎ এক রাতে তার শেষ বার্তা পাই। সে তো বার্তা নয়, যেন কেভরের বুকভাঙ্গা আর্তনাদ। শুধু দুটি বাক্যের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কয়েকটা কথা আমারা বুঝতে পারলাম। প্রথমটি হল, "মূর্খের মত চন্দ্র-সম্রাট্‌কে জানিয়েছি যে"—

এরপর মিনিট খানেকের স্তব্ধতা। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ তার সংবাদ পাঠানোর ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে। হয়ত তাকে যন্ত্র ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয়েছে, তারপরই আবার সুযোগ পেয়ে হয়ত ফিরে এসেছে, শেষ চেষ্টা করবার জন্য, শেষ কথা বলবার জন্য। তাই আমরা শুনতে পেলাম—"কেভরাইট্ তৈরী কি করে করতে হয় বলছি"—তারপরই আবার বিরতি। তারপর আবার একটি কথার অংশ, যার কোন মানেই হয় না।

এই তার শেষ বার্তা!

এই শেষ কথাটি যখন সে পাঠায়, তখনই হয়ত তারও শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার সেই যন্ত্রের কি হল, তা জানবার আর উপায় নেই। তা থেকে কোন দিনই কোন বার্তা আর পৃথিবীতে আসবে না।

আর কেভর! কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, চাঁদের মানুষেরা তাকে চারদিকে ঘিরে ধরেছে, তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে; তারা তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেই অতল অন্ধকার গুহায় যেখান থেকে আর সে কোন দিনই মুক্তি পাবে না।

এমনি করেই শেষ হয়ে গেল একটি অমূল্য জীবন। কে জানে, আবার কবে তার মত প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হবে, যিনি আবার নূতন করে কেভরাইট্ তৈরি করবেন, আর তারই সাহায্যে মানুষ আবার চাঁদের রাজ্যে পাড়ি জমাবে!

শেষ